শুকতারা
সপ্তবিংশবর্ষ তৃতীয়সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩৭৯
মরণের ডাক!
যাক, ইকটিনোক! ওটা মরেছে, এখন একটু জিরিয়ে নিই, বড়ো ক্লান্ত লাগছে!
রাতে ওঝে যা দেখলাম তা কি মিথ্যে? আমি রেড ইন্ডিয়ানদের মাঝে শ্রেষ্ঠ গুনীন, আমার গননা ভুল! ওর মৃত্যু রেখা পরিষ্কার দেখেছি! মৃত্যু ওর হবেই!
বেশ! ঘুমানো যাক!
ইকটিনোক চিন্তা করে!
রাত নেমে এলো মেলভাজের বুকে! এই সমাধিক্ষেত্রে কোন জীবন্ত জীব আসবেনা। এ এক অলিখিত নিয়ম জঙ্গলের! তারা নিশ্চিন্তে শুয়ে পড়ল!
কিসের শব্দে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে যায় মিকনেশাসের!
এ কি?
মিকনেশাসের কি মৃত্যু হবে? গুনীনের গননা কি অভ্রান্ত!

রূপকথা

ছোটরা যেখানে আমাদের বইও সেখা

ছোট বড় সকলকে আনন্দ দেয় রূপকথার গল্প। ছোটরা তো রূপক বই হাতে পেলে আর কিছুই চায় না। সেই বন্দিনী রাজকন্যা, সোনার কাঠি রূপোর কাঠি আর সেই পক্ষিরাজের পিঠে রাজপুত্র…এমনি আ কত সুন্দর সুন্দর গল্প আছে…

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত

ভূত পেত্নী দত্যি দানা-4.00

ঠানদিদির থলে-4.00

ঠাকুরমার ঝুলি-4.00

সুনির্মল বসুর

নিঝুমপুরের স্বপনকথা-১.২

হেমেন্দ্রলাল রায়ের

গল্পের মায়াপুরী ২.

। আরও অনেক বই।

রোমাঞ্চকর উপন্যাস

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়বার মত বই

হেমেন্দ্রকুমার রায়ের

কিং কঙ্ ১.৫০

সূর্যনগরীর গুপ্তধন-১.৫০

হিমালয়ের ভয়ঙ্কর ১.২৫

আবার যখের ধন ১.৫০

যোগেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের

অন্ধকূপের বন্দী-১.০০

নীহাররঞ্জন গুপ্তের

রক্তমুখী ড্রাগন-১.২৫

নীহাররঞ্জন গুপ্তের বিষের তীর ১.২৫

বিস্তারিত তালিকার জন্য চিঠি লিখুন।

দেব সাহিত্য কুটীর • ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

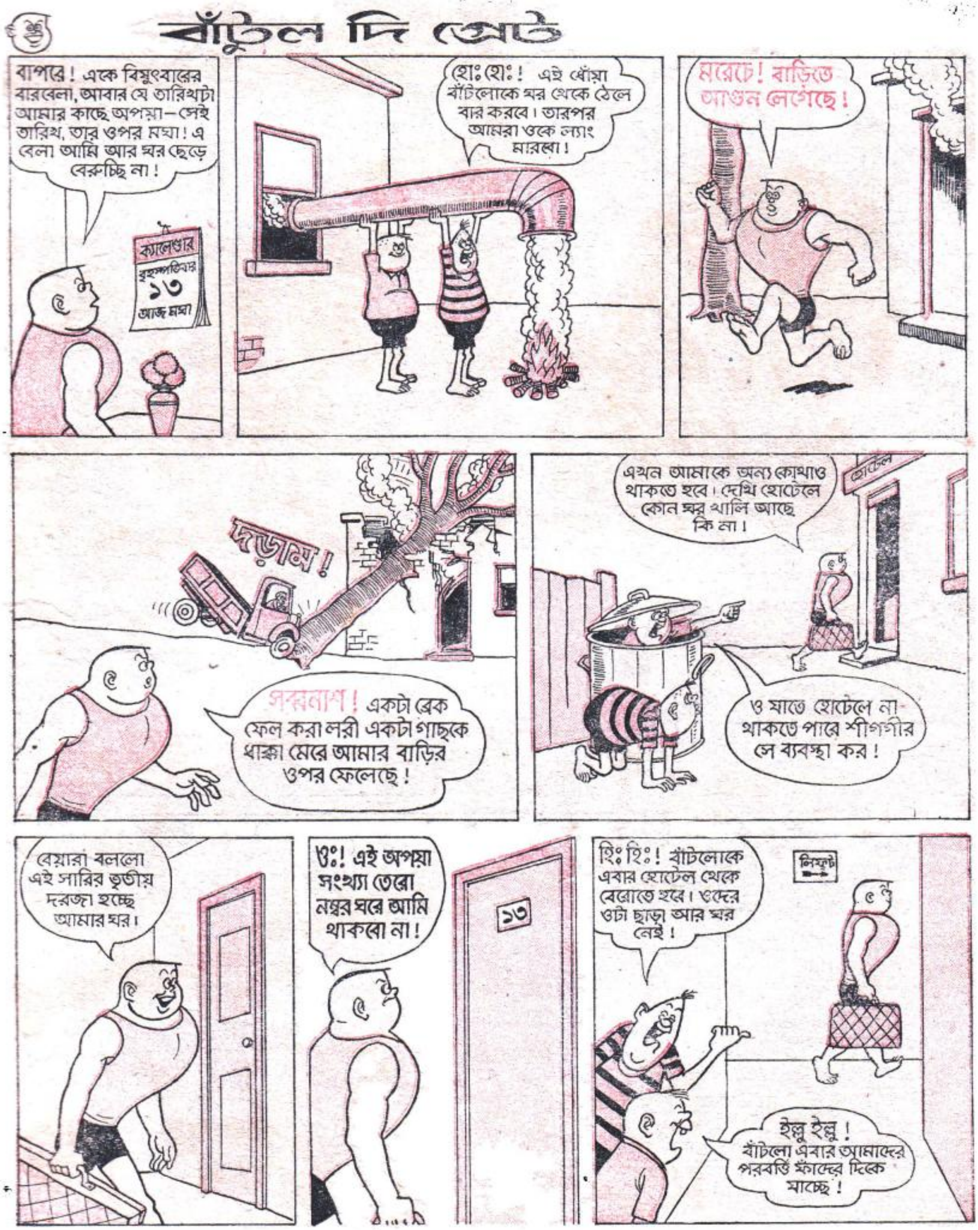
বাঁটুল দি গ্রেট
বাপরে! একে বিষ্যুৎবারের বারবেলা, আবার যে তারিখটা আমার কাছে অপয়া—সেই তারিখ, তার ওপর মঘা! এ বেলা আমি আর ঘর ছেড়ে বেরুচ্ছি না!
ক্যালেণ্ডার
বৃহস্পতিবার
১৩
আজ মঘা
হোঃ হোঃ! এই ধোঁয়া বাঁটলোকে ঘর থেকে ঠেলে বার করবে। তারপর আমরা ওকে ল্যাং মারবো!
মরেছে! বাড়িতে আগুন লেগেছে!
দড়াম!
সর্ব্বনাশ! একটা ব্রেক ফেল করা লরী একটা গাছকে ধাক্কা মেরে আমার বাড়ির ওপর ফেলেছে!
হোটেল
এখন আমাকে অন্য কোথাও থাকতে হবে। দেখি হোটেলে কোন ঘর খালি আছে কি না।
ও যাতে হোটেলে না থাকতে পারে শীগগীর সে ব্যবস্থা কর!
বেয়ারা বললো এই সারির তৃতীয় দরজা হচ্ছে আমার ঘর।
ওঃ! এই অপয়া সংখ্যা তেরো নম্বর ঘরে আমি থাকবো না!
১৩
হিঃ হিঃ! বাঁটলোকে এবার হোটেল থেকে বেরোতে হবে। ওদের ওটা ছাড়া আর ঘর নেই!
লিফ্‌ট
ইল্লু ইল্লু! বাঁটলো এবার আমাদের পরবর্ত্তি ফাঁদের দিকে যাচ্ছে!

আমার একটু তাড়া আছে। তাই আগে যাওয়া দরকার, কিছু মনে করোনা!
লিফ্‌ট
এ্যাই মরেছে! লিফ্‌টের ফোঁকরে লিফ্‌ট নেই!
আরে বাঃ! বাঁটলোর জন্যে পাতা ফাঁদে ধরা পড়লো কিনা কোন এক বুদ্ধু!
অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁক!
হোটেল চোর গুলে পটকা! একে ধরার জন্যে ধন্যবাদ! পটকাকে ধরার পুরস্কার ঘোষনার পাঁচ হাজার টাকা তুমি পাবে।
বাহ্‌! কোথায় পড়ে ওর হাত পা ভাঙবে, তা নয়, কোত্থেকে এক দাগী চোর পড়লো আর মাঝখান থেকে বাঁটলোটা পাঁচ হাজার টাকা পেয়ে গেলো! কিন্তু ও টাকা কিছুতেই বাঁটলোকে নিয়ে যেতে দেবো না, ওটা আমরা নেবো!
বাস থামিবে
থানা
হোঃ হোঃ! বাঁটলোর চোখে এতো সহজে ধুলো দেওয়া যাবে ভাবিনি!
যে ভাবেই হোক আমরাই ধরলুম দাগীটাকে আর পুরস্কারের টাকা নেবে বাঁটলো—হেঃ! আয় এবার আমরা দুজনে আমাদের হকের ধন সমান ভাগ করে—
অ্যাঁ-অ্যাঁ-অ্যাঁ!
বোঁও-ও-ও-ও!
বোঁও-ও-ও-ও!
ইয়াঁও!
এ্যাঁয়াও!
কি থেকে কি হলো বলতো মাইরি! মঘাতে কাঁথা দেবার জন্যে ওকে ঘর থেকে বের করলুম, উল্টে ও ই চালাকি করে আমাদের কাঁথা দিয়ে দিলে!

৯৫

"শুকতারা"

Approved by the Directorate of Public Instruction, West Bengal as Children's Monthly Magazine vide No. 321 (9)-T. B. C.

(Dated 14th August, 1971. 2B-20G/71)

সূচীপত্র—বৈশাখ, ১৩৭৯

	বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	ময়ূরের ডাক	তুষার চ্যাটার্জী	প্রচ্ছদপট
২।	বাঁটুল দি গ্রেট	নারায়ণ দেবনাথ	প্রথম ছবি
৩।	কবচ কাব্য (কবিতা)	রাম চট্টখুণ্ডী	১৫৫
৪।	বিষুব রেখার অন্তরালে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু	১৫৭
৫।	বল তো মেয়েটি কি করছে ? (মজার ছবি)	—	১৬৬
৬।	বড়র পীরিতি বালির বাঁধ (বিদেশী গল্প)	শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা	১৬৭
৭।	আগন্তুক (ছবিতে গল্প)	মন্মথ চৌধুরী	১৭৪
৮।	অহংকারী ঘোড়া (গল্প)	শ্রীঅনন্তকুমার বিশ্বাস	১৭৬
৯।	হাঁসের কূটনীতি (জানবার কথা)	—	১৮৩
১০।	এক যে ছিল রাজা (জীবনকথা)	শ্রীতাপসেন্দ্রনাথ বোস	১৮৪
১১।	ভাববার কথা (জানবার কথা)	—	১৮৬
১২।	পুতুলপুরীর রূপকথা (গল্প)	নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী	১৮৭
১৩।	"৺ষষ্ঠী ঘোষাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা" (ঘোষণা)		১৯২
১৪।	বাংলার দুলাল মহীপাল (অমর বীর কাহিনী)	শ্রীমধুসূদন মজুমদার	১৯৩
১৫।	অজানিত-তথ্য মাধ্যাকর্ষণ : ধৈর্যশীল শিল্পী (জানবার কথা)	—	১৯৯
১৬।	সেয়ানে সেয়ানে (গল্প হলেও সত্যি)	তারকনাথ চৌধুরী	২০০
১৭।	১৬৬ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর	—	২০১
১৮।	হাঁদা-ভোঁদার গোয়েন্দাগিরি (ছবিতে গল্প)	—	২০২
১৯।	ছায়াছবির কথা	পূরবী দেবী	২০৪
২০।	পাণ্ডব গোয়েন্দা (রহস্য গল্প)	ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়	২১১
২১।	পরের তরে আত্মদান (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	শ্রীকিশলয় রায়চৌধুরী	২২০
২২।	প্রাণের বিনিময়ে (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা)	বিশন মিত্র	২২২
২৩।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)	—	২২৫
২৪।	মন থারাপ (খেলাধুলা)	শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	২২৭

এস. সি. মজুমদার কর্তৃক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং শ্রীমধুসূদন মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত। মূল্য ৮০ পয়সা

রসেভরা...মনের মত...মজাদার
মাত্র ২৫ পয়সা
PARLE
POPPINS
25 Paise
নতুন পার্লে
পপিন্স
ফলের স্বাদেভরা লজেন্স
লেবু, জামীর, কমলালেবু, আনারস আর র‍্যাস্পবেরী—এই ৫টি ফলের স্বাদে ভরপুর কমদামের সুন্দর সুন্দর প্যাকে খুব সুস্বাদু ১৩টি লজেন্স পাওয়া যাচ্ছে।
৫টি ফলের মজা পাবেন, পপিন্স যখনই খাবেন
everest/122b/PP ben

শুকতারা

পঞ্চবিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা

১৩৭৯, বৈশাখ

কবচ-কাব্য

রাম চট্টখুণ্ডী

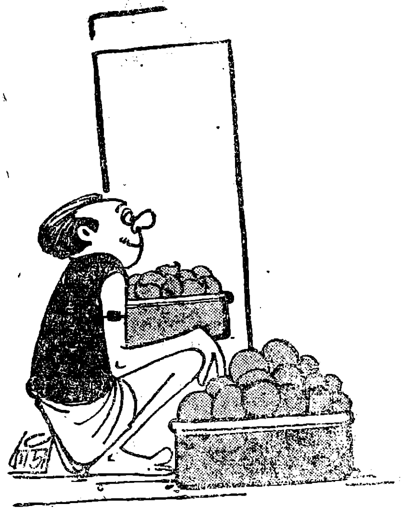

পথের মোড়ে দোকান করে
        শ্রীহরিদাস হালদার,
কমলা, কলা, আপেল, লিচু—
        আম বেচতো মালদার।
হঠাৎ বরাত ফিরবে বলে
        হদিস মেলে চমৎকার—
গুণে-গেঁথে ষাট টাকাতে
        কবচ দিলো গণৎকার।
কবচ পরে ভাবলো মনে—
        ভাগ্যটা যেই ফিরবে

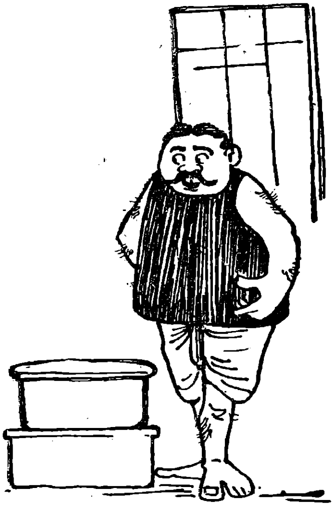

রাজা-উজির, মন্ত্রী, না হয়
নেতার দলে ভিড়বে।
বাড়ির পাশে ঘুগনি বেচে
রূপরাজ সিং মোটকা—
তার তেলানি ভাঙতে হবে
দাওয়াই দিয়ে টোটকা।
শেষে গণেশ উলটে গেলো;
শ্রীহরিদাস হালদার—
লাটে উঠে ব্যবসা-পাতি
হলো হাঁড়ির হাল তার।

গণৎকারের কাছে গিয়ে
বললে রেগে হরিদাস ঃ
লোক-ঠকান ব্যবসাটি আর
চলবে বলো, ক'টা মাস ?
গণক বলেঃ তোমার মতো
থাকলে হরিদাসের দল
মনের সুখে চালিয়ে যাবো
ব্যবসা—এমন গেঁড়াকল !

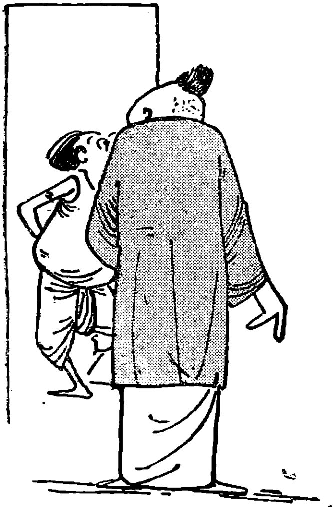

কবচ পরে সত্যি যদি
কপাল ফেরে ভাই রে!
নিজের হাতে না পরে কি
পরকে দিতে যাই রে ?

শ্রীহীরেন্দ্রকুমার বসু

১

"উল্লা হো—উল্লা হো হুইল্লাল্—লা হুইল্লাল্—লা হুইল্লাল্—লা"—সমস্বরে দশ-বারজন মাঝিমাল্লাদের এক সুরে একঘেয়ে চীৎকার কাজিঙ্গা চ্যানেলের দুটি তীরের ঘন জঙ্গলকে মাতিয়ে তুলছে···তার সঙ্গে দশ-বারখানা দাঁড়ের ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ···

দাঁড়ের শব্দের তালের ছন্দ আর মোটা ভারী গলার আওয়াজের প্রতিধ্বনিকে বারবার ব্যাহত করছে সূচীভেদ্য জঙ্গলের বিকট ঝিঁঝির ডাক।

···গায়ের মধ্যে থমথম করছে···সারা শরীরটা যেন ঝিমঝিম করে ঝিমিয়ে আসছে···

এক অজানিত ভয় উৎকণ্ঠা নীরব অপেক্ষায় উৎকীর্ণ হয়ে রয়েছে···মুখের তালু পর্যন্ত শুকিয়ে দিচ্ছে···আমরা চলেছি উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর পথে।

লেক এডোয়ার্ড আর লেক্ জর্জ—এদের দুটিকে সংযুক্ত করেছে এই কাজিঙ্গা চ্যানেল।

লেক এডোয়ার্ড থেকে আবার এক জলস্রোত বেরিয়ে নতুন নাম নিয়েছে—সেমলিকি নদী। সে নদী গিয়ে মিশেছে লেক অ্যালবার্টে।

কাটউই জঙ্গলের বুক চিরে সেমলিকি নদীর প্রখর স্রোত ছুটে চলেছে উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর পথে···লেক অ্যালবার্টের পশ্চিম কূলে কূলে।

আফ্রিকাকে কথায় বলে "কালো মহাদেশ" (DARK Continent), অথচ সূর্যকিরণ বোধকরি পৃথিবীর এই মহাদেশেই সর্বপ্রথম প্রখরিত হয়ে সারা বনস্থলীকে অগ্নিবাণে জর্জরিত করে। চড়া রৌদ্রের কড়া তাপে এখানকার লোকগুলোকে করে তুলেছে কষ্টিপাথরের খোদাইকরা মূর্তি···যেমনি লম্বা তেমনি চওড়া···হাতে তাদের দোধারী বর্শা।

বিষুবরেখার উঁচু পিঠখানা যেন উটের পিঠের মত হঠাৎ কুঁজ তুলে ছুটে চলেছে সারা পৃথিবীটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে…নদী জঙ্গল পাহাড় কাউকেই রেহাই দেয় নি…।

সামনের পাহাড়টা যেমন উঁচু তেমনি ছুটে চলেছে পঞ্চাশ মাইল ধরে…সবাই বলে 'রিয়াঞ্জারো রেঞ্জ'…

বিষুবরেখার গরম তাপেও এর মাথায় মাথায় বরফস্রোত…একটা নয় তিন তিনটে শিখর…সব কটাতেই বরফ জমে কাঠ হয়ে রয়েছে। বিষুবরেখার শিরদাঁড়ায় দাঁড়িয়ে বরফের মুকুট পরে এই তিন পাহাড় যেন প্রকৃতিকে উপহাস করছে…

এদেরই নাম 'চাঁদের পাহাড়' (Mount of the Moon).

সবচেয়ে উঁচু চূড়াটির নাম 'মারঘারিটা'—১৬.৭৯৫ ফুট—তারই ডাইনে বামে এমিন আর আলেকজেন্দ্রা—এদের উচ্চতাও কম নয়। ১৫.৭৫৪ ফুট আর ১৬,৭২৬ ফুট।

এই তিনপাহাড়ীর মাথায় আর পেছনের পিঠে যারা বসবাস করছে তাদেরও প্রকৃতির জীবদের মধ্যে এক অবিশ্বাস্য জীবন।

মারঘারিটার চূড়ায় যাদের বসতি তারা কিন্তু শ্বেতাঙ্গ…তারা সাধারণ আফ্রিকানদের মত কালো নয়। এদের চুলও কালো কাফ্রীদের পশম-চুলের মত নয়। বছরের মধ্যে একবার মাত্র তারা পাহাড়ের নীচে নেমে আসে নুন সংগ্রহ করতে। বাকী সবই তাদের আছে…আছে চাষবাস, গৃহ, বনসম্পদ্ সবই।

মারঘারিটার পেছনে যাদের বসতি তারাই উত্তর-পূর্ব কঙ্গোর বীভৎস 'পিগমী'র দল।

জঙ্গলের মধ্যে ছোট ছোট তালপাতার ঘেরাটোপের মত ছাউনিতে এদের বাস… খায় কাঁচা মাংস…শুধু পশুর নয় নরমাংসও এদের বড় প্রিয়…পিগমী…বেঁটে মানব!

বর্বরতায় বনের সব জন্তুদের হার মানিয়ে দেয়। ছোট ছোট দু' ফুট তিন ফুট মানুষগুলোর বুদ্ধি যেন সিম্পাঞ্জীদেরও হার মানায়।

দাঁতগুলোকে এরা উকো দিয়ে ঘষে সরু ধারাল ফলার মত করে রাখে…মুলোর মত দাঁত দিয়ে ছাগলছানা নয় মানুষ পর্যন্ত চিবোবে বলে।

এরা আবার মস্ত শিকারী…

তীর-ধনুকে এরা অসম্ভব পারদর্শী…অব্যর্থলক্ষ্য। তীরের ফলার আগায় থাকে সাপের বিষ। যাকে বিদ্ধ করে তাকেই নিমেষে মৃত্যুর নিশ্বাস ফেলতে হয়।

এরা জীবনে স্নান করে না…অথচ—

এরা অদ্ভুত সাঁতারু কিন্তু জলকে এরা এড়িয়ে চলে…জলকে বড় ভয় পায় অথচ এরা অনায়াসে কুমীর জলহস্তীর কবল থেকে পিছলে বেরিয়ে আসে।

এদের দৃষ্টি যেমন প্রখর তেমনি হিংস্র…এদের দলের চলাফেরা অতি সাবধানী…

সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে এরা এদের ছোট ছোট প্রখর চোখগুলি পেতে গাছের কাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের মিশিয়ে রাখে⋯এরা যেন সব জঙ্গলের বহুরূপী।

যেমন রঙের মাঝে থাকে তেমনি রঙ বদলায়⋯এদের হাসিতে যেন মায়া মাখানো⋯ কিন্তু সে হাসির পেছনে ভরা থাকে এক ভয়াল ভ্রূকুটি।

তাই বলছিলাম মাউণ্ট মারঘারিটার ওপরতলার লোক যেমন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য তেমনি মারঘারিটার অপর পারের জীবরাও হচ্ছে পৃথিবীর নবম আশ্চর্য।

তীরবেগে নৌকা চলেছে অদ্ভুত সঙ্গীতের তালে তালে⋯

বাংলাদেশে নৌকাভ্রমণ করে মনে হয়েছিল কর্মময় জীবনের মাঝে মাঝে নৌকাভ্রমণে বার হলে মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে⋯কিন্তু আফ্রিকার এই ঘনতমসাবৃত বনের মধ্য দিয়ে নৌকাযাত্রায় মনে প্রতিটি মুহূর্তে আনছে শঙ্কা আর বিহ্বলতা⋯

দাঁড়ীদের গানের সুর ভেদ করে হঠাৎ এক বিকট চীৎকারে আমাদের স্বপ্ন ভঙ্গ করে দিল⋯মাথার ওপর দিয়ে একঝাঁক হর্নবিল পাখী উড়ে চলে যাচ্ছে⋯চীৎকারটা তাদেরই কণ্ঠাগত উল্লাস।

মনে মনে ভাবলাম⋯এমন উল্লাস তো কখন বাপের জন্মে শুনিনি⋯এ যেন পেটের পিলেটা পর্যন্ত চমকে তুললো।⋯মাখন সিং হেসে উঠলেন, বললেন—ভয় নেই, ওগুলো হর্নবিল পাখী।

মাখন সিং হচ্ছেন আমাদের এ অঞ্চলের শিকারী গাইড⋯

আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরতে গেলে চাই বনাঞ্চলের গাইড যাঁরা বন্দুক হাতে আপনাদের পথও দেখাবেন আর জীবনও রক্ষা করবেন। অবশ্য এঁদের রীতিমত অর্থ দিয়ে নিজেদের জুটিয়ে নিতে হয়। আমাদের টাঙ্গানাইকার গাইড ছিলেন মিঃ একমান⋯ সুইডিশ হাণ্টার⋯কিন্তু তাঁর এ এলাকা নয়⋯এ এলাকার বিশেষজ্ঞ হচ্ছেন মাখন সিং ⋯পঞ্জাবকেশরী।

লেক জর্জের অনতিদূরে 'বারারা'⋯মাখন সিং সেইখানেই বসবাস করেন। কঙ্গো ও টোরোর জঙ্গলগুলো তাঁর নখদর্পণে।

হাতীর জন্যে বিখ্যাত জঙ্গল যেমন টোরো তেমনি 'কিবাকো' অর্থাৎ জলহস্তী, বিভিন্ন জাতের বন্যজন্তু, কুমীর ইত্যাদি জলজন্তুর জন্যে বিখ্যাত হচ্ছে এই কঙ্গোর জঙ্গল ⋯এরই দুরান্ত বনবিভাগ ঘিরে ন্যাশনাল অ্যালবার্ট পার্ক যেখানে পৃথিবীর হেন কোন হিংস্র বনচর নেই যা না পাওয়া যায়⋯এমনকি ভয়াল ভয়ংকর গরিলা পর্যন্ত।

দশ-বারখানা দাঁড়ের ঘোলাজল তুফান তুলতে তুলতে নৌকাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলো বটে কিন্তু মাঝে মাঝে কিবাকোরা জলে তুফান তুলে হুস্ করে ভেসে উঠে

আমাদের নৌকায় সোজা গতিকে বানচাল করে দিচ্ছিলো—একসঙ্গে এতগুলো জলহস্তী আমাদের জীবনে কখনও দেখিনি।

এদের দল যখন সচকিত হয়ে একসঙ্গে জল থেকে মাথা তুলে আমাদের নৌকার পানে তাকাচ্ছিল, মনে হচ্ছিলো যে এবার বুঝি আর নিস্তার নেই…কিন্তু,

এদের হিংসার চেয়ে নিজেদেরই ভয় বেশী—তাই জল তোলপাড় করে তীরের দিকে ছুটে চলেছে…

মানুষকে ভয় করে না এমন জন্তু বিশ্বে দুর্লভ। অথচ মানুষও মনে মনে সবার ভয়ে ত্রস্ত।

জঙ্গলের যে কোনো জন্তু…মানুষ দেখলে দূরে গা ঢাকা দিতে চায় যদি না তারা আক্রান্ত হয়। আক্রমণের সম্ভাবনা বুঝলেই তারা ফিরে রুখে দাঁড়ায় প্রতিবাদ করতে… তখনই বাধে মানুষে জন্তুতে লড়ালড়ি।

কাফ্রী দাঁড়ীদের হেঁড়েলো স্বর শুনে তীরে তীরে হরিণ জিরাফের দল ছুটে চলেছে …জিরাফগুলো যখন ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে ছুটে চলছে মনে হচ্ছে এক হলুদ রঙের ঢেউ নিকট থেকে দূরান্তে মিলিয়ে যাচ্ছে…এদের সঙ্গে অস্ট্রিচের দলও কম নেই।

নদী এবার গভীর জঙ্গলের মাঝে বাঁক নিয়েছে…পাশের জঙ্গলের ঝুঁকে পড়া গাছগুলো মাথা নীচু করে জল ছুঁয়ে রয়েছে…তাদেরই শাখায় শাখায় শাখামৃগেরা নিঃসংকোচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। এদেরও আছে নিজের নিজের দল…এক এক গোষ্ঠীতে এরা শতাবধিও বিরাজ করছে। কেউ হলদে কেউ পাটকিলে, আবার কারো সারা অঙ্গ জেব্রাদের মত চিত্র-বিচিত্রিত।

পারে পারে হাতীদেরও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না এমন নয়। তবে তাদের বায়নাকুলার দিয়ে দেখতে হচ্ছে।…হঠাৎ নৌকার গতি মন্থর হলো। কাফ্রীভাষায় বয়রা চেঁচিয়ে উঠে বললো—বানাকুবা (মহাশয়) আগে মাট্—

কি ব্যাপার ? আগে বাড়তে বারণ করছে কেন ?

মাখন সিং ওদের ভাষায় কি যেন সব বললেন…তারপর আমার হাত থেকে বায়নাকুলারটা নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন…হঠাৎ বায়নাকুলার থেকে চোখ নামিয়ে বললেন—সর্বনাশ! নদীর এপার ওপার বেয়ে যে মাকড়সারা জাল বিছিয়ে রেখেছে…

আমি বললাম—মাকড়সার জাল তো কি হয়েছে…আমাদের চোখে মুখে তো জালের ঘেরাটোপ রয়েছে…নৌকা জাল ফেড়েই চলে যাবে।

মাখন সিং জিবেতে আর তালুতে মিলিয়ে একটা চুকচুক আওয়াজ তুলে বললেন

—তা হয় না মিঃ বোস। এ আপনাদের ইণ্ডিয়ার মাকড়সার জাল নয়। এদের নাম আফ্রিকান ব্ল্যাক স্পাইডার। এদের জালে ছোট ছোট বন্যজন্তু পর্যন্ত আটকে যায়।

বিস্ময়ে দু'চোখ বিস্ফারিত করে ওঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকি···

উনি বলেন—এখন মনে হচ্ছে চর্নবিল পাখীগুলো কেন অমন চীৎকার করতে করতে ছুটে পালিয়ে গেল। জানেন মিঃ বোস এ জালে পাখীরা প্রায়ই বন্দী হয়ে মাসাবধি ঝুলতে থাকে আর মাকড়সাগুলি ধীরে ধীরে তাদের গ্রাস করতে থাকে।

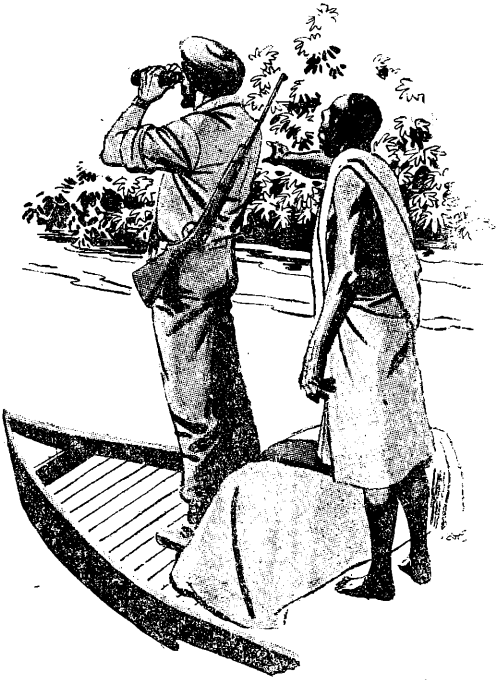
বায়নাকুলারটা নিয়ে নিরীক্ষণ করে দেখতে লাগলেন··· [পৃষ্ঠা ১৬০

বিষুবরেখার ধারের দেশগুলোকে ক্রান্তিমণ্ডল বলা হয়। কর্কটক্রান্তিতেই এরা সবচেয়ে বেশী উৎপাত করে···তখন এরা এই সমস্ত পাখী শিকার ছেড়ে ছোট ছোট বন্যজন্তু ধরার চেষ্টায় গাছ থেকে গাছান্তরে জাল বিছোতে থাকে···তখন জঙ্গলে প্রবেশ করে কার সাধ্য···ওই দেখুন মিঃ বোস, নদীর জলে এসে জালটা ছুঁয়ে পড়েছে তাই দুটো মাছ জলের উপর লাফাতে গিয়ে ওদের জালে বাঁধা পড়ে কেমন করছে।

এই সমস্ত মাকড়সার মাথা আর পেটের উপরভাগের ব্যবধানে বাদামী আকারে একখানা কঠিন ফলক আছে—পেটটা তাতেই সংযুক্ত। পেটটা ফোলা আর ভারী নরম। আটটি পায়ে সাতটি করে গাঁট রয়েছে আর শেষের পায়ে কাঁকুইয়ের মত দুটি কাঁটা থাকে। এদের সামনের চোয়াল সাধারণ মাকড়সার মত পতঙ্গচোয়াল নয়···ঐ চোয়াল ওরা সব দিকে ঘুরিয়ে নাড়তে পারে···চোয়ালের শেষে তীক্ষ্ণ কাঁটা আছে—তার মধ্যে কিংবা পাশে অতি ক্ষুদ্র ছেঁদা আছে···সেই ছেঁদা দিয়ে বিষাক্ত তরল পদার্থ বার করে দেয়···আর দুটো চোয়ালের মধ্যে জিবটাকে মুখের বাহির ইন্দ্রিয়ের মত ব্যবহার করে।

এরা কেউ সাধারণ মাকড়সার মত জালে বাস করে না···এরা জাল বিস্তার করে পাশে গর্ত খুঁড়ে বাস করে যাতে শিকারের কোন বাধা না হয়···যখন শিকার ধরা পড়ে তখন দল বেঁধে তাকে করে নিঃশেষ।

মিঃ ব্যানার্জী, আমার সহকর্মী বললেন—সিলোনে একরকম মাকড়সার কথা শুনেছিলাম, তারা নাকি টিকটিকি পর্যন্ত শিকার করে···

আমি বললাম—তা কেন, হিমালয়ে পাটকিলে রঙের একরকম মাকড়সা আছে যারা নাকি জাল বিছিয়ে পাখী পর্যন্ত ধরে। কিন্তু ছোট ছোট জন্তু ধরে খায় এ কথা এই প্রথম শুনছি—

মাখন সিং হেসে বললেন—মাকড়সা বহু জাতেরই আছে এবং ভিন্ন উপায়েও শিকার ধরে···কিন্তু এই কালো মাকড়সারা সারা পৃথিবীর বিস্ময়···এরা হচ্ছে 'ট্যারেন্টুলা' গ্রুপের।

ট্যারেন্টুলা নামটা আমার জানা ছিল যা হোমিওপ্যাথি ওষুধে পাওয়া যায়·· শুনেছি সে ওষুধটা মাকড়সার রস থেকেই তৈরী···যাতে করে প্লেগ পর্যন্ত সারে··· তাই জিজ্ঞেস করি—ট্যারেন্টুলার কথাটা ভালো করে একটু বুঝিয়ে বলুন তো!

মাখন সিং বললেন—এদের দু'রকম জাত আছে···একটা ছোট, আর একটা বড়। ছোটগুলো নানা রঙের হয়—কালো, হলদে, গোলাপী, এমনকি সাদা···এরা বালির ওপর দিয়ে চললে বেশ বোঝা যায়—কিন্তু বড়জাতের ট্যারেন্টুলা গ্রুপের মাকড়সারা দেখতে পাটকিলে থেকে কালো রংএর হয়··এরা পাখী ছোট জন্তু শিকার করে খায়। এরা নদীর পাশে বালিমাটিতে বা শুধু বালুচরে নিজেদের বাসা বাঁধে। জালের সামনে ট্রাপ-ডোর থাকে। জন্তু বা পাখী সেই দরজা দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করলেই দরজাটা আপনাআপনি বন্ধ হয়ে যায়···অর্থাৎ মরণফাঁদে ফেলে শিকার করে। শিকার পড়লেই ছুটে এসে শিকারের গায়ে কামড় দিয়ে বিষাক্ত রস তার সারা দেহে ছড়িয়ে দেয়, তখন জন্তুটি বিষের জ্বালায় ছটফটিয়ে মরে যায়।

যে জালখানা নদীর এপার-ওপার বিছিয়ে রেখেছে ওটাকে ছিঁড়ে নৌকা যদি চলে যায় তাহলে নৌকাটা নিজেই আটকে পড়বে তাই একে ক্রস করে যেতে হলে অন্য উপায় স্থির করতে হবে···

নৌকা ধারে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে···

মাখন সিং কাফ্রীভাষায় বয়দের কি যেন বললেন···তারা আগুন জ্বালাবার ব্যবস্থায় তীরে নেমে পড়লো···এবং অপর দল চলে গেল অপর পারে···এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই দু'পারে আগুন জ্বলে উঠলো দাউদাউ করে।

কাজিঙ্গা চ্যানেলের দুই তীরের কিনারা ধরে আগুনের শিখা হঠাৎ যেন তরল স্রোতের মত ছুটে এগিয়ে চললো সেই মাকড়সার জালের দিকে।

তরল স্রোতাগ্নি দেখে বললাম—এ কি করে সম্ভব যে আগুনের শিখা স্রোতের মত ছুটছে?

মাখন সিং বললেন—এর দু'পাশের উইড্‌স্‌গুলো কাঁচা অবস্থাতেই দাহিকা শক্তি রাখে। আর শুধু রাখে না প্রায় কর্পূরের মত দাহিকা শক্তিসম্পন্ন। যেমন কাশ্মীরে 'জুনিপার' গাছের কাঁচা ডালগুলো দাউদাউ করে জ্বলে।

নদীর দু'পাশে আগুনের স্রোত দেখে পারের জন্তুজানোয়ার ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাতে শুরু করলো আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেল।

আগুনের হলকায় বাতাসের জোর বেড়েছিল—

সেই জোরালো বাতাসে হঠাৎ উড়ে চললো একটা প্রকাণ্ড সিল্কের সুতোর জাল··· তা যতদূর এগিয়ে চলে যেন বেলুনের মত চুপসে যেতে থাকে সূর্যকিরণ পড়ে—এ আর এক অভিনব দৃশ্য···

২

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ আমরা এসে পৌঁছলাম লেক এডোয়ার্ডের মোহনায়। সন্ধ্যা বলতে এখানকার সন্ধ্যা নয়···ঈস্ট আফ্রিকায় সন্ধ্যা নামে রাত সাতটায় কিন্তু বিষুবরেখায় সন্ধ্যা নামে রাত সাড়ে আটটায়। অথচ চাঁদ যথাসময়েই ওঠে অর্থাৎ বেলা পাঁচটায়। সূর্য তখনও ধকধক জ্বলতে থাকে পশ্চিম আকাশের ওপরতলায়।

দিনের বেলায় এমন চাঁদ দেখেছিলাম 'মাউ সামিট'এ। 'মাউ সামিট' আর 'ইকোয়েটর' এই দুটি জায়গাতেই রেলওয়ে স্টেশন আছে। ইকোয়েটরের উচ্চতা ১০,০০০ ফুট আর মাউ সামিটের হচ্ছে ৮,৩২২ ফুট। দুটি স্টেশনই হচ্ছে বিষুবরেখার পাহাড়ী শিরদাঁড়ায় অবস্থিত।

পাহাড়ী শিরদাঁড়া এই জন্যে বলছি কারণ বিষুবরেখার প্রাকৃতিক গঠন যেন একটি পাহাড়ী শিরদাঁড়া···পঞ্চাশ ফুট উচ্চতা নিয়ে সারা পৃথিবী বেয়ে ছুটে চলেছে। এই শিরদাঁড়ার সর্বোচ্চতা সৃষ্টি করেছে রিয়াঞ্জারো রেঞ্জ।

মানুষ বিষুবরেখার শিরদাঁড়া আবিষ্কার করে তাতে সাদা চুনের দাগ দেগে দিয়েছে···তার দু'পাশে বড় বড় অক্ষরে সাদা রং দিয়ে ইংরেজীতে লিখে রেখেছে নর্দার্ন হেমিসফিয়ার আর সাদার্ন হেমিসফিয়ার, যার কথা আমার 'বনে জঙ্গলে' বইএ লেখা হয়ে গেছে।

লেক এডোয়ার্ডের মোহনায় নৌকা বাঁধা হলো। স্থানটি ঘন জঙ্গলে আবৃত… কিনারায় নৌকা রাখতে ভয় করে, যদি কোনো জন্তু এসে রাতে আক্রমণ করে।

মাখন সিং বললেন—নীচে নেমে বয়রা রাত্রে আগুন জ্বালিয়ে ক্যানেস্তারা পিটবে'খন …তাহলে ভয় থাকবে না…

ভয় থাকবে না বলে মাখন সিং ভরসা দিলেও আমাদের সঙ্গীদের কারো মন থেকে এতটুকু ভয় দূর হলো না। ত্রস্তদৃষ্টিতে পরস্পর পরস্পরের মুখের দিকে চাইলাম।

অন্ধকার হবার প্রাক্কালেই বয়রা আর দাঁড়ী-মাঝিরা নদীর ধারের জঙ্গলে আগুন জ্বেলে দিল—সেই আগুন ঘিরেই বসলো ওদের ভোজের আসর। গত দিনে বনের মধ্য থেকে একটা বিরাট বন্যবরাহ মারা হয়েছিল, তাই পুড়িয়েই ওদের ভোজের সভা…

আমরা নৌকায় বসে গিনি ফাউলের মাংস আর পাঁউরুটির শ্রাদ্ধ করতে শুরু করলাম।

ডিনার সভার বক্তা হচ্ছেন স্বয়ং মাখন সিং। তিনি আমাদের এদেশের গোল্ড-ডিগারদের গল্প বলতে শুরু করেছেন।

যাঁরাই আফ্রিকার এ অঞ্চল ঘুরে দেখে আসেন তাঁদের মুখেই শুনতে পাবেন গোল্ড কোস্টের সম্মোহনী কাহিনী। রামায়ণের স্বর্ণলঙ্কার মতোই আফ্রিকার গোল্ড কোস্ট …প্রায় তিনশ সত্তর মাইল ধরে স্বর্ণ সৈকতের বিস্তৃতি। এ ছাড়া এ অঞ্চলে ম্যাঙ্গানিজ, বাক্সাইট, হীরা, টিন, গন্ধক…এমনি কত যে খনিজ সম্পদ্ তা বলে শেষ করা যায় না।

তবে ভোল্টা নদীর অববাহিকা ধরেই স্বর্ণ সৈকতের প্রসিদ্ধি। সৈকতের বালিতেই যে শুধু স্বর্ণচূর্ণ পাওয়া যায় তা নয়, বড় বড় সোনার পাহাড়ও লেক অ্যালবার্টের পশ্চিম কিনারে সারি সারি দাঁড়িয়ে। প্রতিদিন এ সমস্ত পাহাড় থেকে এক টনের ওপরও সোনা সংগ্রহ সম্ভব হয়, তবে গোল্ড-ডিগাররা তাঁদের প্রয়োজন অনুযায়ীই স্বর্ণ খনন ও সংগ্রহ চালান।

পূর্ব সীমানা 'কুইটা' থেকে শুরু হয়ে স্বর্ণ সৈকত পশ্চিমে 'অশ্বিনী' পর্যন্ত সীমা ঠিক করেছে। এই সৈকতের দু'পাশ ঘিরে পাহাড় আর জঙ্গল…এসব পাহাড়ের বুকেও সোনা পাওয়া যায়। এই সব পাহাড় বেয়ে যে সমস্ত নদী ভোল্টার বুকে নেমে এসেছে তাদের জলেও সোনার কুচি।

পাহাড় ধুয়ে ভোল্টার বুকে জলধারা এসে পড়ার মুখে বালুস্তূপে-স্তূপে জড় হয় এই সব স্বর্ণচূর্ণ…এ ছাড়া আরও বিখ্যাত দুটি নদীসৈকত রয়েছে…সেখানেও অজস্র সোনা…

'আন্‌কোবয়া' আর 'প্রা'…

এই তিনটা নদীর মিলনস্থানটির নাম 'থ্রি পয়েন্ট'। এই থ্রি পয়েন্ট পর্যন্ত বিস্তারিত এই সৈকত।

মাখন সিং বললেন গোল্ড-ডিগারদের ভয়াবহ জীবনের কথা…তিনশ সত্তর মাইল-ব্যাপী স্বর্ণসৈকতে গোল্ড-ডিগারদের পাহারাদারী…অথচ এই বিস্তৃত জলাভূমি ঘন বনসংকুল এবং বিভিন্ন নরখাদক পশু ও জংলীদের বসবাস…

একলা পেলেই পথিক ও ভ্রাম্যমাণদের ধরে বেঁধে আগুনে ঝলসে তারা ভোজ সমাধা করে।

এদেরই একদল হচ্ছে পিগমি বা বেঁটেবামন।

জংলীদের অগ্নিই হচ্ছে আরাধ্য দেবতা।

আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া তাই তাদের কাছে পরম পবিত্র ভোজ…

আগুনে পুড়িয়ে খাওয়া তাই তাদের কাছে পরম পবিত্র ভোজ…কারণ প্রথমে অগ্নিদেবতা প্রসাদ করে দিয়েছেন…তারপর তাদের ভোজের উৎসব। অগ্নিদেবতার উৎসবেই নাচ-গান গাছের রস সেবন চলে…মানুষদের জ্যান্ত গাছে বেঁধে পোড়ায় আর আনন্দ হুল্লোড় চলে।

জিজ্ঞেস করলাম—এসব বায়স্কোপের ছবিতে দেখেছি বটে তবে সত্যি কি এসব এদের বন্য আচার ?

মাখন সিং বলছেন—আজও এ পদ্ধতি গভীর জঙ্গলের জংলীদের মধ্যে বর্তমান রয়েছে…কেবল টাউনের কাফ্রীদেরই কিছুটা জাগরণ হয়েছে—তবে অগ্নিকে দেবতা বলে বলে বন্দুককে ওরা ভয় পায়…বন্দুক ছুঁড়লে ভাবে বুঝি অগ্নিদেবতা রাগ করে অগ্নিবৃষ্টি স্ফুরণ করছেন।

ছোট ছেলেদের মতো গল্প শুনতে শুনতে কখন যে খাওয়া শেষ করেছি জানি না হঠাৎ একটা টংকারধ্বনিতে চমকে উঠে উঠে দাঁড়ালাম।

সকলেই সচকিত…মায় মাখন সিং পর্যন্ত…

বয়রা তাদের হুল্লোড় থামিয়ে কান খাড়া করে সে টংকারে মনোযোগ দিল…

অতিদূর হতে সে টংকারধ্বনি ভেসে আসছে—মনে হচ্ছে যেন একশখানা ঢাকাড়ায় একসঙ্গে ঘা দিয়ে চলেছে।

বুকের মধ্যে হৃদ্‌পিণ্ডের ধকধকে আওয়াজটা যেন প্রখর হয়ে কানে এসে বাজতে থাকে · সবার মুখেই দেখা যাচ্ছে এক আসন্ন সংকট-ছবি।

উৎকীর্ণ মাখন সিং নিশ্বাস ফেলে বললেন—ভয় নেই, tusk-seekerএর দলেদের দামামা।

টাস্‌ক-সীকার ?…সে আবার কি ?

মাখন সিং বললেন—এ এক মজার আশ্চর্য গল্প-কথা বলতে পারেন। টাস্ক-সীকাররা হাতীর দাঁতের সন্ধানে ঘুরে বেড়াতো। আফ্রিকার বন্যহাতীদের ধরাও যেমন শক্ত বশ করা তার চেয়েও বেশী শক্ত। কাজেই হাতীর রাজত্বে এসে হাতীর দাঁতই যদি যোগাড় না হয় তা ভারী মুশকিলের কথা তো…

কিন্তু আফ্রিকার হাতী পোষ মানানো সোজা নয়। তাই হাতী মেরেই দাঁত সংগ্রহ করা পদ্ধতি চলে আসছিল বহুদিন ধরে। কিন্তু ১৭৫২ খ্রীঃ এডোয়ার্ড ডেলাউ সাহেব হাতীর মরণগুহা আবিষ্কার করেন। আবিষ্কার করেছিলেন অভিনব উপায়ে।

বাজারে অর্থাৎ বুনোদের হাটে বাটা সিস্‌টেমে কিছু কিছু হাতীর দাঁত যে যোগাড় হতো না এমন নয় তবে প্রচুর পরিমাণে হাতীর দাঁত পেতে গেলে হাতীদের ধরে, বশ করে দাঁত কেটে নেওয়াই আফ্রিকার সব জায়গার প্রথা। (ক্রমশঃ)

বল তো মেয়েটি কি করছে ?

(না পারলে ২০১ পৃষ্ঠায় দেখ)

বিদেশী গল্প

বড়র পীরিতি বালির বাঁধ

শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ রাহা

বনেদী বংশ ঐ মনট্রেসরেরা। রোমের সৃষ্টি থেকেই তারা আছে রোমে। তিন হাজার বছরের দীর্ঘ ইতিহাস ওদের, রোমের ইতিহাসের সঙ্গে এমনভাবে তা জড়িত যে দুটোকে বিচ্ছিন্ন করা কোন পুরাতত্ত্ববিদের সাধ্য নয়।

প্রাসাদের যেটা দরবারঘর, তার চার দেয়ালে শতাধিক ছবি। মনট্রেসরদের একশো পুরুষের চেহারা পর পর সাজানো। পৃথিবীর সেরা চিত্রশিল্পীরা জন্মেছেন ইতালিতে, তাঁদের প্রত্যেকের তুলির কাজ নানাবর্ণসুষমায় উজ্জ্বল হয়ে ফুটে রয়েছে ঐ আলেখ্যমালায়।

আর এই ছবির সারির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঐ প্রাসাদেরই সর্বনিম্নতলায় সাজানো রয়েছে কঙ্কালের সারি, সে-সব কঙ্কাল খ্রীষ্টপূর্ব যুগের মনট্রেসর নায়কদেরই। খ্রীষ্টান হবার পর থেকে অবশ্য তাঁদের বংশের সমস্ত শব এখন সেণ্ট পিটার্স-এর কবরখানায় সমাধি দেওয়া হচ্ছে।

ঐ নিম্নতম তলাটা সত্যি সত্যি কত নীচে? মনট্রেসর-কর্তারা ছাড়া এযুগে সে-খবর আর কেউ বলতে পারে না। বিশাল অট্টালিকার মাটির উপরকার দুটো তলাই শুধু লোকের চোখে পড়ে, মাটির নীচে যে কয়টা তলা ছিল বা আছে, তা নিয়ে ভদ্রমহলে চলু আছে বিবিধ আজগুবী জল্পনা। অতিরঞ্জন বলে তার বারো-আনা আন্দাজ ছাটকাট করলেও যেটুকু অবশিষ্ট থাকে, তাও দস্তুরমত চমকপ্রদ।

কতখানি চমকপ্রদ, তাই বোঝাবার জন্যই দুই-একটা নমুনার উল্লেখ করা যাক। এক নম্বর হল এই যে একটা তলা শুধু সোনাদানায় ভর্তি, তবে পূর্বপুরুষদের অভিশাপ আছে—কোন বংশধর সত্যিকার জরুরী প্রয়োজনে ছাড়া সে-ঐশ্বর্যের অপব্যয় করার চেষ্টা করলে সে সর্পদংশনে মারা পড়বে। এমন নাকি মারা পড়েছেও কেউ কেউ। কাল-সর্পের একটা পল্টন নাকি রেমাস-রমুলাসের আমল থেকেই ঐ সোনাদানাগুলির পাহারায় রয়েছে।

আর এক নম্বর নমুনা—

মাটির তলায় যে-কয়টা তলাই থাকুক, সব-নীচেরটি গ্রানাইট পাথরে গড়া, পৃথিবী যতদিন ধ্বংস না হচ্ছে, ক্ষয় নেই সে পাথরের। সেই গ্রানাইট-দেওয়ালের গায়ে গায়ে হাড়ের স্তূপ। কফিনে বন্ধ করেই অবশ্য গতাসু ডিউক মহোদয়গণকে রেখে আসা হয়েছিল সেই অন্ধকার সমাধিক্ষেত্রে, তা সে-কাফনের কাঠ আর কতদিন অটুট থাকবে? পচে

গলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে হাড়ের পাহাড়েই মিশে গিয়েছে। এখন হাড় শুধু, নগ্ন, নির্মল, অম্লান সাদা হাড়। মশাল জ্বাললেই খটখট করে হাসতে থাকে মশালধারী বংশধরকে দেখে।

বলা বাহুল্য এসব মহলের চাবি কর্তার নিজের কাছেই থাকে, এসব মহলের রাস্তাও চেনে না কর্তা ছাড়া আর কেউ।

ডাক অ্ মনট্রেসর—অর্থাৎ বর্তমান যুগের যিনি ডিউক, লোকটি সুখী। শৈশব, কৈশোর এবং যৌবনেরও আর্ধেকটা কেটেছে বিলাসের সাগরে সাঁতার দিয়ে দিয়ে। এখন, যৌবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে যদিও কতকটা সংযত হয়েছেন ভদ্রলোক, তবু দুটি ঝোঁক তাঁর এখনও প্রবল। একটি হল—দেশবিদেশে দালাল পাঠিয়ে ইউরো-এসিয়ার সেরা সুরা পিপে হিসাবে খরিদ করে আনা, আর একটি হল—অন্তরঙ্গ বন্ধুদের ডেকে মাঝেমাঝেই তাদের রাজকীয় সমারোহে ভোজ দেওয়া। বলে রাখা দরকার—ডিউক চিরকুমার।

একটা বৈশিষ্ট্য এই নব্য মনট্রেসরের চরিত্রে—বন্ধুরা যত প্রিয় বা যত অন্তরঙ্গই হোক, তাদের কাউকে তিনি অত্যধিক প্রশ্রয় কখনও দেন না। নিজের অতুলনীয় আভিজাত্য নিয়ে গর্ব তাঁর প্রচণ্ড, সে আভিজাত্যের মর্যাদায় কেউ এতটুকু আঁচড় কাটবে, এ তাঁর অসহ্য।

এখন, সেই কুকর্মটিই একদিন করে বসল তাঁর সবচেয়ে বড় সুহৃদ্ আর্মাণ্ডো ফর্চুন্যাটো। আর্মাণ্ডোই ভদ্রলোকের আসল নাম, ফর্চুন্যাটো হল সর্বসাধারণের দেওয়া খেতাব। লোকটি অশেষ ভাগ্যবান বলেই বন্ধুমহল তাকে অভিনন্দিত করেছে ঐ নামে। ফর্চুন কিনা সৌভাগ্য। আর্মাণ্ডোর মত ফর্চুন কার? তিন তিনটা লড়াইয়ে আহত হয়েছে, মরেনি। তিন তিনবার বিয়ে করেছিল, তিনটি বউই মরেছে, বছর ঘোরেনি কারও।

আভিজাত্য তেমন কিছু নয় আর্মাণ্ডোর, আড়াইশো বছর আগের কোন ইতিহাস ওদের বংশের নেই। এহেন লোককে যে বন্ধু বলে গ্রহণ করেছেন মহামান্য মনট্রেসরের ডিউক, এ তাঁর খেয়াল ছাড়া কিছু নয়। লোকটার বড় গুণ—মদের সে জহুরী। গন্ধ শুঁকেই বলে দিতে পারে, কোন্ সুরার কী মেকদার।

হ্যাঁ, ফর্চুন্যাটো বেশ ছিল, খেয়ে দেয়ে নেচে কুঁদে। হঠাৎ সে ঐ কুকর্মটা করে বসল। গ্রহের ফের আর কি! ছয়শো বছর আগে যিনি মনট্রেসরের ডিউক ছিলেন, তাঁর কথা তুলে বর্তমান ডিউককে করল ঠাট্টা। উক্ত আদিপুরুষ নাকি কোথায় যুদ্ধে তুর্কীদের হাতে বন্দী হয়েছিলেন, এবং প্রাণ বাঁচাবার জন্য দীক্ষা নিয়েছিলেন তুর্কীদের ধর্মে। দেশে ফিরেই আবার তিনি খ্রীষ্টান বনে গেলেন, তা সত্যি, কিন্তু কলঙ্কটা রয়েই গেল। আর্মাণ্ডোর মত কুরুচিবান লোকেরা আড়ালে অন্তরালে এখনও মনট্রেসরদের হাফ-তুর্কী বলে ঠাট্টা করে।

হ্যাঁ, আড়ালে ত রাজার মাকেও ডাইনী বলে থাকে অনেকে। রাজার কানে সে

মনট্রেসরের মুখের চেহারা দেখে···হাসি চাপল। [পৃষ্ঠা ১৭০

কথা আসে না, এলেও রাজা তা এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বার করে দেন। কিন্তু তা বলে সামনে কেউ বলুক ত দেখি! তক্ষুণি হেঁটে কাঁটা উপরে কাঁটা দিয়ে নিন্দুকটাকে মাটিতে পুতে ফেলবেন না!

রাজা মনট্রেসরেরা কোনদিন ছিলেন না, তা ঠিক। কিন্তু কিছুদিন আগেও নিজেদের জমিদারির ভিতরে বা বাসভবনের ভিতরে প্রতাপ তাঁদের ছিল রাজারই মত। যুদ্ধের সময় জমিদারি থেকে হাজার সৈনিক তাঁরা জমায়েত করতে পারতেন নিজেদের পতাকার নীচে। শান্তির সময় রোমের মনট্রেসর প্রাসাদে দু'শো সৈনিক স্থায়ী ভাবেই বাস করত। মাটির তলার প্রথম তলাটাই ছিল তাদের আস্তানা।

তখনকার দিনে যা ছিল, এখন আর তা নেই। এখন সৈন্য রাখবার অধিকার আর জমিদারদের নেই, তা চলে গিয়েছে ইতালির রাজার হাতে। সান্ত্রী গোটাকতক অবশ্য আছে এখনো দেউড়িতে, কিন্তু তরোয়াল ধরতে তারা জানে কিনা, সন্দেহ।

এই যখন অবস্থা, বিশেষ করে বর্তমান ডিউক যখন আমুদে, আড্ডাবাজ, মজলিসী, বন্ধুবৎসল মানুষ, তখন তুর্কীঘটিত কেলেঙ্কারির কথা আড়াল ছেড়ে প্রকাশ্যে আলোচিত হবে মাঝে মাঝে, এ আর এমন কী আশ্চর্য?

ভরা মজলিসে দুবু দ্ধি ফচু ন্যাটো একদিন সেই কথাটাই তুলে বসল।

মনট্রেসর অন্য এক বন্ধুকে হাসতে হাসতে বলেছিলেন—"ভোজনবিলাসী আমি আদৌ

নই। দরকার হলে দুই-একদিন মোটে কিছু না খেয়েও কাটিয়ে দিতে পারি। কিন্তু ভাই, মদ না পেলে একটি ঘণ্টাও কাটবে না, পেট ফুলেই মারা যাব—"

দুর্বুদ্ধি ফচুন্যাটো! কথা হচ্ছে অন্যের সঙ্গে, তোর সে কথার ভিতর ফোড়ন না দিলেই চলছিল না! সে এধার থেকে বলে বসল—"তোমার সেই ছয়শো বছর আগেকার পূর্ব-পিতামহ, তাঁর কিন্তু এ-স্বভাব নিশ্চয়ই ছিল না, থাকলে তিনি জীবন নিয়ে তুর্কীদেশ থেকে ফিরতে পারতেন না। মুসলমানের মুলুকে ত মদ হারাম!"

বন্ধুরা কেউ কেউ এ রসিকতায় হেসে উঠতেই যাচ্ছিল, কিন্তু মনট্রেসরের মুখের চেহারা দেখে তারা দাঁতে ঠোঁট কামড়ে ধরে হাসি চাপল। ফর্চুন্যাটো নিজেই খলখল করে হাসল একটুখানি, কিন্তু কোন দিক থেকে কোন সাড়া না পেয়ে বোধহয় বুঝতেই পারল যে একথাটা একান্তই অশোভন হয়েছে এখানে। অপ্রস্তুত-ভাবটা চাপা দেবার জন্য সে তাড়াতাড়ি ভোজনে মনোনিবেশ করল।

মনট্রেসরকে সে মজলিসে কেউ আর একটি কথাও কইতে শুনল না।

এ ঘটনার পর পুরো একটি বছর কেটেছে। যারা সেদিন হাজির ছিল সেদিনকার খাওয়ার টেবিলে, তারা ভুলেই গিয়েছিল ও কথা। স্বয়ং মনট্রেসরেরও যে ও কথা মনে আছে, এমন কোন লক্ষণ দেখা যায়নি তাঁর আচরণে বা আলাপনে। এই দীর্ঘদিনের ভিতরে এক মুহূর্তের জন্যও না।

খোদ ফর্চুন্যাটোর সঙ্গেও মনট্রেসরের ব্যবহার ঠিক আগের মতই অমায়িক। কোনদিন যে ফর্চুন্যাটোর তরফ থেকে ডিউকের দুঃখ বা রাগের কোন কারণ ঘটেছে, তা যেন তাঁর মনেই নেই। দেখা হলেই হাসি, হুল্লোড়! হোটেলে হোটেলে পানভোজন, মাঝে মাঝে ডিউকের গৃহেও নিমন্ত্রণ—ঠিক আগের মতই।

তুর্কীঘটিত পরিহাসটার আর পুনরাবৃত্তি করেনি ফচুন্যাটো। কথাটা যে ডিউকের কানে মধুবর্ষণ করে না, সেটা হুঁশ হয়েছে ওর।

হুঁশটা যদি গোড়া থেকে থাকত—!

রোমের কার্নিভ্যাল। এত সমারোহের আনন্দোৎসব পৃথিবীর আর কোথাও হয় না। দীর্ঘ এক মাস ধরে মহানগরী যেন পাগলের মত আচরণ করে। পথে পথে উদ্যানে উদ্যানে বাজারে বাজারে নরনারীর উদ্দাম নাচ চলছে ত চলছেই। হাসি আর গান! মজাদার ছদ্মবেশে যত্রতত্র অভিযান! ইউরোপের প্রতি কোণ থেকে প্রমোদসন্ধানীরা ছুটে আসে মধুলুব্ধ ভৃঙ্গের মত।

কার্নিভ্যালের এক সন্ধ্যায় ডিউক বেরিয়ে পড়েছেন পদব্রজে। গাড়িঘোড়া তাঁর অনেক আছে, কিন্তু পায়ে হেঁটে না ঘুরলে কার্নিভ্যালের মজা পাওয়া যায় না। তা ছাড়া জনাকীর্ণ রাজপথে গাড়িঘোড়া চালানোও বিপজ্জনক।

অনেকেই ছদ্মবেশে ঘুরছে রাস্তায়। ডিউক কোন ছদ্মবেশ ধারণ করেননি, কিন্তু একখানা কালো সিল্কের রুমাল টুপির নীচে থেকে গলাবন্ধ পর্যন্ত ঝুলছে তাঁর, মুখখানা একদম ঢাকা। হঠাৎ হাওয়ায় টুপি নড়ে গেল, রুমাল খুলে পড়ল, আর টুপি এবং রুমাল যথাস্থানে পুনঃস্থাপিত হওয়ার আগেই—

একটা লোহার দরজা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ এইখানে। [পৃষ্ঠা ১৭২

নিয়তি-তাড়িত ফচু ন্যাটো এসে হাত ধরল—"হ্যাল্লো ডিউক—"

"আরে, ফচু ন্যাটো যে! তোমায় দু'দিন দেখতে পাইনি। না পেয়ে অবশেষে লুকেসিকে ডাকতে যাচ্ছি। ভারী দরকার পড়েছে একটা—"

"কী? কী দরকার? লুকেসিকে দিয়ে কোন্ দরকার মিটতে পারে তোমার? ও জানে কী?" ফচু ন্যাটোর গলায় ঈর্ষার ঝাঁজ।

"এক পিপে অ্যামন্টিদালো কিনেছি ভাই, সিরিয়া থেকে এসেছিল—"

"অ্যামন্টিদালো? এই দারুণ শীতের দিনে? ঠকোনি ত?"—সংশয় প্রকাশ করে ফচু ন্যাটো। সংশয়ের সত্যিই কারণ রয়েছে। সিরিয়ার ঐ সেরা সুরা বসন্তকালে ছাড়া আসে না। সেক্ষেত্রে একেবারে পিপে-ভর্তি মাল!

"আমারও সন্দেহ হচ্ছে ভাই। তখন ঝোঁকের মাথায় কিনে ফেললাম। একদিন দেরি করে যে তোমাকে দেখিয়ে নেব, সাহস হল না দেরি করতে, পাছে অন্য কেউ নিয়ে নেয়। কিন্তু মনটা ছোঁক ছোঁক করছে. লুকেসিকে ডাকতে যাচ্ছি, সে এসে দেখলে হয় এস্পার নয় ওস্পার—নিশ্চিন্দি হতে পারি—"

"লুকেসি?"—অবিমিশ্র তাচ্ছিল্য ফচু ন্যাটোর কথার সুরে—"লুকেসি? শেরীকে অ্যামন্টিদালো বলে চালিয়ে দিলে যে তফাত ধরতে পারবে না?"

"কী করি বল, তোমার ত সময় নেই! এই কার্নিভ্যালের সময়, তোমার কত বন্ধু, কত বান্ধবী, এইত চলেছ দিব্যি নটবর সেজে—কোথায় কে অপেক্ষা করে আছে, বল ত?"

"থাকুক! আমি তোমার অ্যামন্টিদালোটা না দেখে পারব না—চল এক্ষুণি—" ফচু ন্যাটো হাত ধরে টানে ডিউকের।

"তুমি যাবে? তুমি ত মাঝে মাঝে কাশছ একটু একটু। অথচ, আমার সুরার ভাঁড়ার, শোনোনি যে আমি সব মদের পিপেই নীচের, মানে সব-নীচের তলাতেই রাখি, পুরোনো মন্ত্রেসরদের হাড়গোড়ের পাশে?"

"শুনেছি বোধহয়। একদিন তুমি বলছিলে না? তা, রাখো সে ভালই কর। ঠাণ্ডায় থাকে। মদ ঠাণ্ডাতেই থাকে ভাল। চল, যাই। লুকেসি? অ্যামন্টিদালো আর শেরীর মধ্যে তফাত কোন্‌খানে, তা যদি লুকেসি জানত, তাহলে ভাবনা ছিল কী?"

"কিন্তু তোমার ঐ কাশিটা? সব-নীচের তলাটা যে বড্ডই ঠাণ্ডা!"

"আরে, কাশিতে মানুষের কী হয়? চল চল—"

ভৃত্যেরা কার্নিভ্যালে গিয়েছে। সান্ত্রীরা ঝিমুচ্ছে। নিজের চাবি দিয়ে ডিউক গোপন দরজা খুললেন একটা, ঘরের ভিতর ঢুকে তবে মুখের ঢাকনা অপসারিত করলেন। সারা পথ তিনি কালো সিল্কের রুমালটা মুখের উপর ঝুলিয়ে রেখেছিলেন।

মহলের পর মহল নিঃশব্দে পার হয়ে যাচ্ছেন ডিউক। তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামতে শুরু করলেন। ভূগর্ভের এক তলা, ভূগর্ভের দুই তলা, ভূগর্ভের তিন তলা। সিঁড়ির মাথাতেই মশাল ছিল আগে থেকে, দুটো মশাল জ্বেলে একটা ডিউক নিজের হাতে নিয়েছেন, অন্যটা দিয়েছেন ফচু ন্যাটোর হাতে—

"তুমি সত্যিই বেজায় কাশছ ভাই! শেষ তলায় আর নেমে দরকার নেই। তুমি এখনও ফিরে যাও, আমি বরং লুকেসিকেই—"

"কী যে বল! লুকেসি অ্যামন্টিদালো আর শেরীর তফাত বোঝে নাকি? চল চল, অ্যামন্টিদালো চাখবার জন্য মনটা যে কীরকম করছে আমার—"

একটা লোহার দরজা দিয়ে সিঁড়ির মুখ বন্ধ এইখানে। অর্থাৎ এই দরজার উপরটা জীবিত মানুষের রাজ্য, নীচেরটা মৃতের।

মরচে-পড়া দরজা। খুলতে গিয়ে নানা বিটকেল আওয়াজ। গ্রানাইটের দেওয়ালে সোরা ঝুলছে। দেওয়ালের গায়ে গায়ে হাড়ের গাদা, পুরো কঙ্কাল কমই চোখে পড়ে, ঝুরো হাড়ই অগুনতি।

সেই হাড়ের গাদার পাশ থেকেই একটা মেডকের বোতল টেনে বার করলেন ডিউক, তার গলাটা এক ঘায়ে ভেঙ্গে বোতলটাকেই ফচু ন্যাটোর হাতে দিলেন—"খেয়ে ফেল, তোমার কাশির উপকার করবে—"

মেডকটা গলায় ঢেলে দিয়ে ফচু ন্যাটো বলল—"তোফা জিনিস! কিন্তু তোমার অ্যামন্টিদালো কই?"

একটা লোহার শিকল দিয়ে তার গলা গ্রানাইট স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা।

"ঐ যে—ঐ গ্রানাইটের স্তম্ভ দুটোর মধ্যে একটা বেদী গাঁথা দেখছ না? ও-বেদীর ভিতরটা খোল, সেই খোলে আছে অ্যামন্টিদালো —এগিয়ে দেখ—"

দুটো স্তম্ভের ব্যবধান দুই ফুট মাত্র। সেই দুই ফুটের ভিতর ঝুঁকে পড়ে ফর্চুন্যাটো দেখল—বোতল নয়, সাদা হাড় একগাদা—

"এ কী এ?" বিরক্ত হয়ে খাড়া হয়ে উঠতে গিয়েই বাধা পেল ফর্চুন্যাটো। একটা লোহার শিকল দিয়ে তার গলা গ্রানাইট স্তম্ভের সঙ্গে বাঁধা।

দুটো স্তম্ভের একটাতে ঝুলছিল শিকল, আর একটাতে বৃহৎ এক তালা। শিকল দিয়ে গলা পেঁচিয়ে তালা আটকে দিতে কয়েক সেকেণ্ডের বেশী লাগেনি ডিউকের।

ফর্চুন্যাটোর পিঠের দিকে ডিউক। কাজেই ডিউকের মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। যা দেখতে পাচ্ছে, তা শুধু হাড় আর হাড় আর হাড়।

আর শুনতে পাচ্ছে ডিউকের কথা—সাপের হিসহিসানির মত বিভীষিকায় ভরা —"তুর্কী মুলুকে মদ হারাম। অ্যামন্টিদালো বা অন্য কোন মদই এখানে নেই। ঐ মেডক, যা একটু আগে খেলে, ঐ তোমার জীবনের শেষ মদ। খেতে আমি দেব, রোজ দু'বেলা নিজে এসে খাবার দিয়ে যাব। কিন্তু মদ নয় ও হারাম।

"ঐরকম শিকলে বাঁধা অবস্থায় যে-কয়দিন বাঁচো, বাঁচতে পার। মনট্রেসরদের ঢালে কী ছবি আছে, তা তুমি দেখেছ। একখানা পা। সেই পায়ের নীচে এক সাপ। পায়ে ছোবল দিতে এসে সেই পায়ের পেষণে থেঁতলে মরেছে সে। নীচের লেখাটাও দেখেছ আশা করি—'নিমো মি ইম্‌পিউনি ক্যামেসিট' অর্থাৎ আমায় আঘাত করে কেউ রেহাই পাবে না।"

এর পরেও ডিউক অর্ধ শতাব্দী বেঁচে ছিলেন, ফর্চুন্যাটোর কী হল, এ-সম্বন্ধে কেউ তাঁকে কোন প্রশ্ন করেনি কোনদিন।*

---

* এডগার অ্যালান পো-রচিত 'এ কাস্ক অব অ্যামন্টিদালো' অবলম্বনে

বাঘের থাবার মতো একজোড়া নখরযুক্ত থাবা চেপে বসল জয়ন্তের মুখ এবং কণ্ঠনালীর উপর ...
আর একটু চাপ দিলে কি হবে বুঝতে পারছো জয়ন্ত ?
জয়ন্ত ! জয়ন্ত ! — মন্হাপ , ওকে ছেড়ে দাও ... আমার ছেলেকে হত্যা কোরো না ...
প্রফেসর ! ওদিকে যাবেন না — স্থির হয়ে এখানে দাঁড়ান...
ছেলেকে যদি বাঁচাতে চান তবে ফরমুলাটা আমাদের হাতে দিন , প্রফেসর ...
ন-ন-নাঃ মনে রেখো বাবা — সমস্ত পৃথিবীর নিরাপত্তার চাইতে আমার জীবনের মূল্য বেশী নয় ।
ফরমুলা কি দেবেন প্রফেসর ?
নিজের সন্তানের প্রাণ বাঁচানোর জন্য আমি সমগ্র পৃথিবীকে বিপন্ন করতে রাজী নই — মন্হাপ ! আমি ফরমুলা দেব না !

(চলবে)

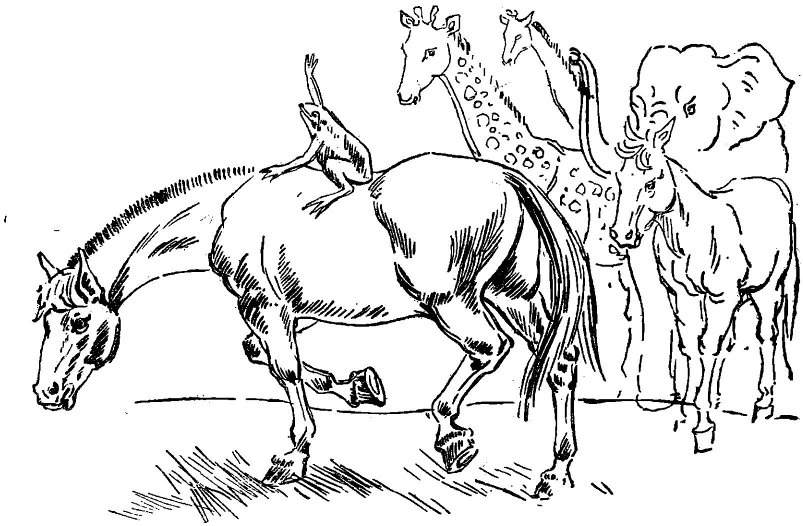

অহংকারী ঘোড়া

শ্রীঅনন্তকুমার বিশ্বাস

এক ছিল রাজার ঘোড়া। তার ছিল ভারি দর্প। রাজবাড়ীর ছোলা, বুট আর গমের দানা খেয়ে খেয়ে সুন্দর চেহারা বাগিয়েছিল সে। ছুটতেও পারতো খুব বেগে। ছুটলে মনে হতো যেন তুফান মেল ছুটে চলেছে। সেই দ্রুততর বেগে ছুটতে দেখে রাজা তার নাম দিয়েছিলেন 'সেনাপতি'। সেই রাজার দেওয়া সেনাপতি নাম আর রাজার আদর পেয়ে ঘোড়াটির মনে অহংকারের সৃষ্টি হয়। অন্য ঘোড়াদের সে ঘোড়া বলেই মনে করতো না। কথায় কথায় বলতো—আরে, তোরা কি ঘোড়া নাকি রে! তোরা তো গাধার অধম। ভেড়া। তোরা কিচ্ছু পারিসনে। তবুও রাজামশায় তোদের বসিয়ে বসিয়ে খেতে দেন। আমি হলে চাট মেরে মেরে তোদের তাড়াতাম। অন্য কোন ঘোড়া তার প্রতিবাদে কিছু বলতে গেলে সে চি-হি-হি চি-হি-হি শব্দে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তো, আর পিছনের দুই পা দিয়ে চাট মেরে মেরে তাকে ঘায়েল করে তবে ছাড়তো। সে কারণ অন্যান্য ঘোড়ারা তার ভয়ে শঙ্কিত হয়ে থাকতো। দুঃখু করে ভগবানের নিকট মনে মনে প্রার্থনা জানাতো—হে ভগবান্! এই অহংকারী ঘোড়ার দর্প চূর্ণ কর। তার চাট খাওয়ার হাত থেকে আমাদের বাঁচাও ঠাকুর!

এই অহংকারী ঘোড়াটা কেবলমাত্র অন্য ঘোড়াদের ওপর অত্যাচার করেই ক্ষান্ত হতো না, অন্যান্য নিরীহ জীবদের ওপরও সে অবাধে অত্যাচার চালাতো। রাজা বছরের প্রায় ছয় মাস আদর করে ছেড়ে দিয়ে রাখতেন তাঁর সেনাপতি ঘোড়াটিকে।

সেই সুযোগে সে গরু, ছাগল, ভেড়া প্রভৃতি নিরীহ জীবদের ওপর চাট মেরে মেরে বেড়াতো। অনেককে পায়ের তলায় ফেলে পিষিয়ে মারতো। এমনি প্রায় অধিকাংশ গৃহপালিত এবং মুক্ত জীবজন্তু এই সেনাপতি ঘোড়ার জন্য অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। কিন্তু এর প্রতিকার কেউ কিছু করতে পারে না।

একদিন হয়েছে কি—দিনটি ছিল নতুন বর্ষার দিন—নতুন বর্ষার জলে খানা-ডোবা সব জলে ডুবে একাকার হয়ে গেল। সেই খানাডোবার জলে দেখা দিল ব্যাঙের আমদানি। 'গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙর-গোঙর' বর্ষাগীতি আরম্ভ করে দিল তারা। কত আনন্দ আর কত মিষ্টি সুরের গান তাদের! সবাই একই সুরে একই গান গেয়ে চলেছে তারা। সকলের গায়ের রঙও এক। গায়ে হলুদ মেখে সবাই যেন একই রঙের বর-কনে সেজেছে। কেউ ডাঙ্গায় উঠে আনন্দে গ্যাঙর-গোঙর ডাকছে, কেউ জলে ডুবোডুবি খেলছে। ডাকতে ডাকতে কষ্ট হলে ডাঙ্গার জনও টুপ করে জলে লাফিয়ে পড়ে মনের আনন্দে ডুবছে। আবার হয়তো দলে দলে ডাঙ্গায় উঠে ডাকছে গ্যাঙর-গোঙর।

ঠিক এমনি সময় রাজার সেই অহংকারী ঘোড়াটা রাস্তার ওপর দিয়ে যাচ্ছিলো। ব্যাঙেদের কাণ্ড দেখে সহসা ঘুরে দাঁড়ালো সে। মনে মনে ভাবলো—এই সব অপোগণ্ড জীবগুলোর জগতে বেঁচে থেকে কি হবে? এরা না পারে কোন কাজ করতে, না পারে আমার মত ছুটতে। মার শালাদের পায়ে পিষিয়ে পিষিয়ে।

এই ভেবে ঘোড়াটি সেই ব্যাঙেদের নিধন-যজ্ঞ শুরু করে দিল। লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যাঙেদের ওপর পড়তে লাগলো আর বহু ব্যাঙ তার পায়ের তলায় পড়ে প্রাণ হারাতে লাগলো। প্রাণভয়ে অনেক ব্যাঙ জলে লাফিয়ে পড়ে ডুব মারলো। কিন্তু ডুবে তারা কত সময় থাকবে? তারা তো আর মাছ নয় যে জলের ওপর না ভেসে পারে। কিছু সময় ডুবে থেকে আবার ভেসে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়াটি যেয়ে লাফিয়ে পড়ে তার ওপর। এমনি করে রাশি রাশি ব্যাঙ যখন ঘোড়ার অত্যাচারে প্রাণ হারাতে লাগলো, তা দেখে ব্যাঙেদের ভিতর থেকে একটি ব্যাঙ মরিয়া হয়ে উঠলো। সে মনে মনে ভাবলো—বিনা কারণে ঘোড়াটি তাদের ব্যাঙ জাতিকে নিধন করছে কেন? ব্যাঙেরা তার কি ক্ষতি করেছে? বড় জীব বলে নিশ্চয় তার অহংকার বেড়েছে। ছোট্ট জীবদের তার জীব বলে পছন্দ হচ্ছে না! পরের বাড়ির বাঁধা গোলামের তেজ বেড়েছে! আচ্ছা, দেখাচ্ছি তোমার তেজ! কিন্তু কি প্রকারে তার কাছে যাওয়া যায়? কাছে যেয়ে কিছু বলতে গেলেই তো সে চাট না ছুড়ে ছাড়বে না। সেই চাট লাগাতে পারলে আমার প্রাণটা যমালয়ে পাঠিয়ে দেবে। তা পাঠাক, তবু এর প্রতিবাদ করা দরকার। আমি একা মরে যদি জাতি বাঁচে তবে তার থেকে ভাল আর কি হতে পারে?

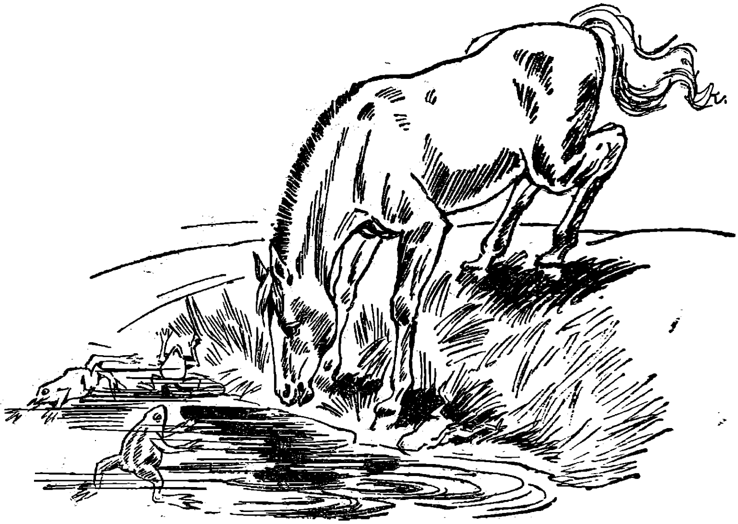

জলের ওপর ভেসে উঠে ব্যাঙটি পুনরায় বললো:—

বিভিন্ন দিক চিন্তা করে ব্যাঙটি প্রাণপণ করে এগিয়ে গেল ঘোড়াটির দিকে। ঘোড়ার চাটের নাগাল থেকে নিজেকে দূরে রেখে সে বলে উঠলো—গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙ! ওহে ঘোড়া মহাশয়, নমস্কার! আমার একটা নিবেদন আছে আপনার নিকট।

—চি-হি-হি! কি বলিস রে ব্যাঙা! ক্রুদ্ধস্বরে বলে ঘোড়াটি একটা জবর লাফ মারলো ব্যাঙটির দিকে। ব্যাঙও ঘোড়ার ভাব বুঝে টুপ করে জলে পড়ে ডুব মারলো।

কিছু সময় পরে জলের ওপর ভেসে উঠে ব্যাঙটি পুনরায় বললো—গ্যাঙর গ্যাঙ! ওহে ঘোড়া মহাশয়, আমার ওপর রাগ করো না। আমরা ছোট প্রাণী বলে ঘৃণ্য নই। শোন শোন!

ব্যাঙের কথার উত্তরে কানফাটান চি-হি-হি-হি শব্দ করে ঘোড়া বললো—তোরা আবার একটা জীব নাকি! ওরে ব্যাঙা রে ব্যাঙা! আমার এক পায়ের চাপে তোরা একসঙ্গে দশ দশটি করে ব্যাঙ মরে যাস। এতে আমার তুলনায় তোরা যে জীব তা কেউ গণনায় ধরে না। তাতে আবার তোদের কি নিবেদন থাকতে পারে?

শুনে ব্যাঙ মনে মনে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলো। কিন্তু সেই ক্রোধ বাইরে প্রকাশ না করে চিন্তা করলে:—ক্রোধ প্রকাশ করলে তো ঘোড়াকে বাগে আনা যাবে না। ওর সঙ্গে সৌহার্দ্য বজায় রেখে কাজ উদ্ধার করতে হবে। এমনি অনেক সময় চিন্তা করে

সে শান্ত স্বরে বললো—গ্যাঙর-গ্যাঙ ! ওহে ঘোড়া বন্ধু ! তুমি আমাদের বন্ধুলোক হয়ে আমাদের ওপর অত্যাচার করছো কেন ?

—চি-হি-হি হি ! কি বললি ? আমি তোদের বন্ধু ?

—গ্যাঙর-গ্যাঙর ! হ্যাঁ-হ্যাঁ ! তোমাদের চারখানা করে পা আছে, আমাদেরও তাই। কিন্তু তোমরা যত জোরেই ছুটতে পার না কেন আমাদের সঙ্গে কোনপ্রকারে তোমরা ছুটে পারবে না। তবু তোমার ভাগ্য ভাল যে আমি ব্যাঙ হয়ে তোমার সঙ্গে কথা বলছি। অন্য কোন ব্যাঙ হলে ঘৃণায় তোমার সঙ্গে কথাই বলতো না, থুতকার দিয়ে তোমাকে তাড়িয়ে দিত।

—চি-হি-চি-হি, হিচ্-হিচ্ ! কি বললি—কি বললি ? আমি ব্যাঙের সঙ্গে ছুটে পারবো না ? ঘোড়া ক্রুদ্ধ হয়ে বললো—আয়, আয় না তবে ব্যাঙাচির পো, দেখি কেমন তোরা ছুটতে পারিস।

সঙ্গে সঙ্গে দুই পা ছুটে দেখালো ঘোড়াটা। তা দেখে ব্যাঙ মৃদু মৃদু হাসলো। পরে বললো—গ্যাঙর-র-র ! এই সেরেছে ! অতটুকু পথের ছুটবো কি ? ছুটতে গেলে পঞ্চাশ, ষাট, নাহয় একশো মাইল ছুটলে তবে আমার পোষাবে। এই এতটুকু পথ ছোটে ঘোড়ারা ! আমাদের ব্যাঙেরা একশো মাইল না ছুটলে সে ব্যাঙই নয়।

ব্যাঙের কথায় ঘোড়া যেন রেগে আগুন হয়ে উঠলো। ব্যাঙকে ধরতে পারলে যেন সে এক্ষুণি পায়ের তলায় চেপে দিয়ে বল ফাটিয়ে ছাড়ে। রাগের চোটে সে কেবল চি-হি-চি-হি শব্দে গোঙরাতে লাগলো আর বলতে লাগলো—আয় রে ব্যাঙাচির পো ! আয় আয়। আসিসনে কেন ? তুই আমাকে এখনও চিনতে পারিসনি। আমি ঘোড়াদের রাজা। মালিক আমার নাম দিয়েছে সেনাপতি। দেশের সমস্ত ঘোড়া আমাকে নমস্কার করে চলে। আর তুই কিনা ব্যাঙাচির পো হয়ে আমার সঙ্গে ছুটতে চাস। আয় তবে !

—গ্যাঙ-গ্যাঙ ! অত লাফালাফি না করে এস একদিন ছুট আরম্ভ করি। আগামী দিন তোমার দলের আরো কয়েকজনকে সঙ্গে করে নিয়ে আসবে। এতে কিন্তু বাজি রাখতে হবে, বুঝলে ? মনে থাকে যেন !

—চি-হি-হি-হি ! কি বাজি রাখতে হবে তুই বল না !

—গ্যাঙর-গ্যাঙ ! তুমিই বল না।

—চি-হি ! শোন তবে। ঘোড়া বললো—তুই হেরে গেলে আমি তোকে পায়ের তলায় পিষে দিয়ে বল ফাঁটাব। আর আমি হারলে তোকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়াব সারা জনম। বাজি রাখা হলো তো ?

—গ্যাঙ-গ্যাঙর ! হয়েছে। ব্যাঙ স্বীকৃতি দিয়ে বললো—এখন যাও, আগামী দিন

সকাল থেকে দৌড় আরম্ভ হবে। সারা দিন দৌড়ে যেখানে যেয়ে রাত হবে সেখানেই থামতে হবে, বুঝলে তো?

—চি-হি-হি-হি-হি-হি-হি-হি—! রাজী রাজী রাজী—বলে ঘোড়া গর্বভরে তুড়ি-লাফ দিতে দিতে চলে গেল।

ব্যাঙ কিন্তু সেদিন সমস্ত দিনরাত ঘুমলো না। খাওয়াও হলো না তার কিছুই। সমস্ত দিন গ্যাঙর-গ্যাঙর-গ্যাঙ গ্যাঙর-গ্যাঙ শব্দে ডাকাডাকি করে রাতের বেলায় এক সভা ডাকলো। যে সকল ব্যাঙেদের কানে পৌঁছেছিল তার ডাক তারা সবাই এসে উপস্থিত হলো সেই ডোবাটির পাড়ে। প্রধান ব্যাঙটি তখন পিছনের দুই পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলো—গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙর-গ্যাঙ! ভাই সব! এক অহংকারী ঘোড়া এসে আমাদের ব্যাঙ জাতিকে পায়ের তলায় পিষিয়ে মারতে আরম্ভ করেছিল। সে দৃশ্য দেখলে সহ্য করা যায় না। আমাদের বহু ব্যাঙকে পিষিয়ে মেরে ফেলেছে। তাই দেখে তাকে প্রতিবাদ করি। শুনে সে ক্রুদ্ধ হয়ে আমার ওপরও আক্রমণ করে। কিন্তু আমি অনেক বুদ্ধি খাটিয়ে তাকে নিরস্ত করি। তখন তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দোড়বার কথা বললে সে তাতেই রাজী হয়ে ফিরে গেছে। আগামী দিন সকালে আবার আসবে। আমরা তো ঘোড়ার সঙ্গে ছুটে পারবোই না। তখন ক্রুদ্ধ হয়ে অহংকারী ঘোড়া পুনরায় আমাদের মারণ-যজ্ঞ আরম্ভ করবে। কাউকে রেহাই দেবে না। এখন ঘোড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য কি করা যায়, সবাই বিবেচনা করুন।

প্রধান ব্যাঙটির কথা শুনে অন্যান্য ব্যাঙেরা আতঙ্কে শিউরে উঠলো। তারপর অনেক সময় গ্যাঙর-গোঙর শব্দ করে তারা বললো—ভাই প্রধান ব্যাঙ! আমাদের মাথায় কোন বুদ্ধি ঢুকছে না। যা করলে ভাল হয়, অত্যাচারীর হাত থেকে বাঁচা যায় তুমি তাই কর।

শুনে প্রধান ব্যাঙটি বললো—গ্যাঙ-গ্যাঙ! এক যুক্তি আছে। আমাদের কোলা-ব্যাঙেদের গলার স্বর সকলের একরকম। গায়ের রঙও তাই। দেখতে সবাই প্রায় আমরা একরকম। ঘোড়ারা দেখে কাউকে চিনে নিতে পারবে না। স্বর শুনেও না। দৌড় আরম্ভ হলে সবাই আমরা ডাকতে থাকবো গ্যাঙর-গ্যাঙর—গ্যাঙর-গ্যাঙর অর্থাৎ আমরা আগে আছি। কিহে ঘোড়া! ছুটে এসো—ছুটে এসো। শুনে শুনে ঘোড়ারা মনে করবে, সত্যিই তো ব্যাঙেরা এখনও আগে আছে। আমরা ওদের সঙ্গে ছুটে পারছিনে। তখন আরো জোরে ছুটবে। আরো জোরে। এমনি সমস্ত দিন ছুটে হাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু এই বর্ষার দিনে আমাদের ব্যাঙেদের ডাক কিন্তু ফুরবে না। দেশ জুড়ে ডাকাডাকি চলতে থাকবে। ছুটে না পেরে ঘোড়া তখন মনে করবে আমি

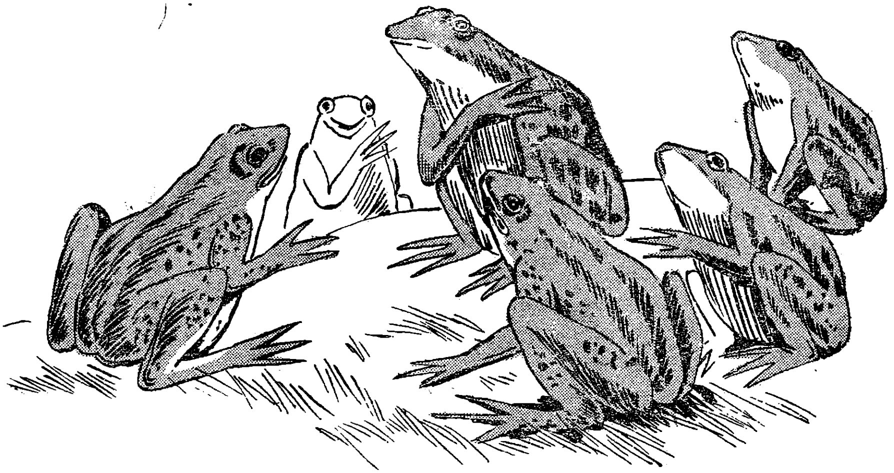

প্রধান ব্যাঙের কথায় এবং মহৎ উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে…

হেরে গিয়েছি। তখন সেখান থেকে যে কোন একজন ব্যাঙ বলে উঠবে—কিহে ঘোড়া মহাশয়! হেরে তো গিয়েছো, এখন তোমার প্রতিজ্ঞা পালন করো। লজ্জিত হয়ে ঘোড়া তখন প্রতিজ্ঞা পালন করতে বাধ্য হবে। ঐ সময় আমাদের ব্যাঙেদের যে কেউ সাহস করে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাগাম ধরে দেশময় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের ওপর অত্যাচারের প্রতিশোধ তুলবে। তাতে ঘোড়ারা তো বটেই, অন্যান্য বড় বড় জীব যারা তারাও ঘোড়ার পরিণাম দেখে বিস্মিত হবে। ব্যাঙেরা ছোট জীব বলে আর কেউ ঘৃণাও করবে না; কোনদিন আর অত্যাচারও করবে না। তারা বুঝবে যে ব্যাঙেদের একতা আছে। তারা এক ডাকে এক সুরে সকলে সাড়া দেয়। তবে আপনাদের একটা কাজ করতে হবে। সমস্ত রাত ডাকাডাকি করে সংবাদটা দেশময় প্রচার করে দিতে হবে। এইটুকু আমার অনুরোধ।

প্রধান ব্যাঙের কথায় এবং মহৎ উদ্দেশ্যকে সমর্থন করে তারা তার নাম দিল 'রাজা ব্যাঙ'। এবং সভাশেষে সমস্ত রাত্রি গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙর-গোঙর শব্দে ডাকাডাকি করে সংবাদটি দেশময় প্রচার করে দিল।

পরের দিন সকালেই সেই সেনাপতি ঘোড়া তার আরো অনেক সঙ্গীদের নিয়ে সেই ডোবাটির নিকটে উপস্থিত হলো। তার চি-হি-হি-হি ডাকাডাকিতে রাজা ব্যাঙটিও তার দলবল নিয়ে হাজির হলো ঘোড়াদের নিকটে। তারপর একধারে লাইন দিয়ে দাঁড়ালো ঘোড়ারা এবং অন্যধারে দাঁড়ালো ব্যাঙেরা। দাঁড়ান হলে সেনাপতি ঘোড়া

রাজা ব্যাঙকে আদেশ করে বললো—চি-হি-চি-হি-চি ! ওরে মূর্খ ব্যাঙ ! তোরা আগে থেকে ছুটতে আরম্ভ কর। দুই চার মাইল গেলে পরে আমরা ছুটবো। নতুবা তোরা পারবিনে। আর এমনি তো তোরা পারবিইনে, জানি। শেষকালে তোদের সকলকে একযোগে পায়ের তলায় পিষিয়ে মারতে হবে সে তো জানা কথা। তবুও আমার ধর্ম আছে বলে তোদের আগে ছুটতে বলছি। ছোট তোরা এখন !

রাজা ব্যাঙ সুযোগ পেয়ে দলবল নিয়ে আগে থেকে তুড়িলাফ মেরে চলতে লাগলো। সেনাপতি ঘোড়া তা দেখে অহংকারে বুক ফুলাতে লাগলো আর বলতে লাগলো—ছোট না তোরা—কতদূর আর যাবি ওই ব্যাঙা পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ! তোদের হাজার লাফ আর আমার এক লাফ।

এদিকে রাজা ব্যাঙ তার দলবল নিয়ে ঘোড়াদের চোখের আড়ালে যাওয়ার পর এক ডোবায় লাফিয়ে পড়ে পূর্বের সেই সংকেত করে ডাকাডাকি আরম্ভ করে দিল। সে ডাক যতদূর পৌঁছায় শুনে অন্য ব্যাঙেরা ডেকে ওঠে। তাদের ডাক শুনে আরো দূরের ব্যাঙেরা ডেকে ওঠে। তারপর আরো দূরের ব্যাঙেরা ডাকে। তারপর আরো দূরের ব্যাঙেরা ডাকে। তারপর দেশ জুড়ে আরম্ভ হয়ে যায় গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙর-গোঙর অর্থাৎ ঘোড়ারা, আমরা এখনও আগে আছি। তোমরা ছুটে এসো—ছুটে এসো ।

এদিকে ঘোড়ারা অর্থাৎ সেনাপতি ঘোড়া ঐ ডাক শুনে তার দলবল নিয়ে ছুট আরম্ভ করলো। তারা দৌড়ে যেখানে যেয়ে পৌঁছায় সেখান থেকে শুনতে পায়—গ্যাঙর-গোঙর গ্যাঙর-গোঙর অর্থাৎ আমরা এখনও আগে আছি। তোমরা ছুটে এসো ছুটে এসো শব্দ। তারা যত শোনে তত জোরে ছোটে। তারপর আরো জোরে। তারপর আরো জোরে। তারপর আরো জোরে। তারপর আরো—আরো—আরো…

এমনি সমস্ত দিন চললো ঘোড়দৌড়। দৌড়তে দৌড়তে তারা যেন আর পেরে ওঠে না। তবুও না ছুটলে ঘোড়া নামের কলঙ্ক হবে ভেবে তারা আরো জোরে ছোটে। ছুটতে ছুটতে ঘোড়ারা হাঁপিয়ে উঠলো। শেষ পর্যন্ত রাত হলে তারা দৌড় বন্ধ করলো। কিন্তু ব্যাঙেদের সেই গ্যাঙর-গোঙর ডাক আর থামলো না। তারা সমানে ডেকে চললো। তখন সেনাপতি ঘোড়া চিন্তা করলো—সত্যিই তো ব্যাঙেদের সঙ্গে ছুটে পারা গেল না। আজ ব্যাঙেদের কাছে পরাজিত হলাম। এ জীবনের আর মূল্য কি ? এমন অপমানের চেয়ে আত্মহত্যা করা অনেক ভাল।

ঠিক এমনি সময় একটি হুঁশিয়ার ব্যাঙ লাফাতে লাফাতে ঘোড়াদের নিকটে এসে বললো—গ্যাঙর-গ্যাঙর গ্যাঙ-গ্যাঙ ! ওহে ঘোড়া মহাশয়, হেরেই যখন গিয়েছ, তখন তোমার প্রতিশ্রুতি পালন করো !

শুনে অপমানে সেনাপতি ঘোড়া মাথা নীচু করলো। হাঁপাতে হাঁপাতে পরে বললো—হ্যাঁ ভাই ব্যাঙ বন্ধু! আমি হেরে গিয়েছি। আমি জানতাম না যে এ জগতে আমার থেকে কেউ বেশী দৌড়তে পারে। আমার সে অহংকার আজ চূর্ণ হয়েছে। আর যে প্রতিজ্ঞা আমি করেছি তা পালন করবই।

এরপর ব্যাঙটি এক তুড়িলাফ মেরে ঘোড়ার পিঠে চড়ে লাগাম কষে ধরে, ঘোড়ার পিঠে জোড়া বেতের বাড়ি মেরে বলতে লাগলো—গ্যাঙর-গ্যাঙা গ্যাঙর-গ্যাঙা! চুটুক্—চুটুক্ চুটুক্—চুটুক্……

পরিশ্রান্ত ঘোড়াটি আর কি করবে, পড়েছে যখন ব্যাঙের ফাঁদে তখন তাকে চলতেই হবে। চলতে আরম্ভ করলো। তা দেখে অন্যান্য ঘোড়ারা বলতে লাগলো—যেমন অহংকার তেমনি তার পতন। এখন ব্যাঙের লাথি খেয়ে অহংকারীর আক্কেল হোক। বলে তারা চি-হি-হি-হি—চি-হি-হি শব্দে বিদ্রূপের হাসি হাসতে হাসতে চলে গেল। এদিকে ব্যাঙেরা সেনাপতি ঘোড়ার পিঠে একজন ওঠে এক জন নামে, এমনি-ভাবে দল বেঁধে তাকে দেশময় ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগলো।

হাঁসের কূটনীতি

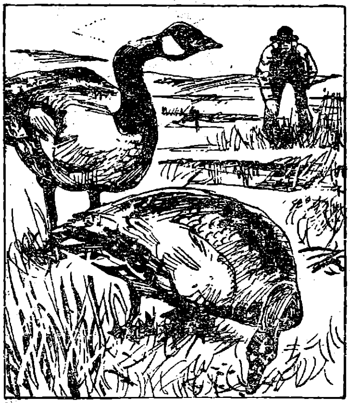

বুকের রং লাল এই ধরনের রাজহাঁসগুলির আদি বাসস্থান সোভিয়েট দেশের অন্তর্গত সাইবেরিয়া প্রদেশের তুন্দ্রা অঞ্চলে। এসিয়া মহাদেশের বাইরে এদের দেখা যায় না। যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যাঞ্চলে কুইভিরা ন্যাসানাল পার্কে বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থলে কানাডার বন্য রাজহাঁসরা আসা যাওয়া করে। সম্প্রতি একটি লালবুকওলা রাজহাঁস তাদের দলে এসে পড়ায় তারা সযত্নে নবাগত অতিথিকে তাদের মধ্যে স্থান দেয়। বন্যপ্রাণীরক্ষী লালবুকওলা হাঁসকে দেখে আশ্চর্য হয়ে যায়। আশ্চর্য হবার কি আছে? নিকসন যদি চীনদেশে সফর করে আসতে পারেন সোভিয়েট হাঁস কি হংসকূটনীতি চালাতে আমেরিকা যেতে পারে না?

এক যে ছিল রাজা

শ্রীতাপসেন্দ্রনাথ বোস

আজ তোমাদের এক রাজার গল্প বলি শোনো। না না, ভয় পাবার কিছু নেই, আমি তোমাদের সেই পুরোনো একঘেয়ে রাজা-রানীর গল্প বলছি না। খেলার রাজা ক্রিকেটের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। সেই ক্রিকেট খেলারই এক রাজার গল্প তোমাদের বলব। মন দিয়ে শোনো।

১৯১৭ সালের এক শীতকালের দুপুর। লণ্ডনের শহরতলিতে ঠিক যেন সবুজ কার্পেট বিছোনো এক ক্রিকেট মাঠে খেলছিল গুটিকতক কিশোর। বয়স তাদের কারুরই বোধহয় ষোল-সতেরর বেশী নয়। কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে তাদের খেলা দেখছিলেন এক প্রবীণ ভদ্রলোক। কিন্তু দেখছিলেন বললে ভুল হবে, তিনি খেলা শেখাচ্ছিলেন। একসময় গুটি-গুটি পায়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়াল একটি ছেলে। বছর চোদ্দ বয়স হবে। ফরসা রঙ, মাঠে যে ছেলেগুলো খেলছিল তাদের চেয়ে সামান্য বেঁটেই হবে। প্রবীণ ভদ্রলোকটি ঘুরে দাঁড়ালেন ছেলেটির মুখোমুখি।

"কি চাই?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"আমি কি ওদের সঙ্গে খেলতে পারি?" জড়সড়ভাব কাটিয়ে জিজ্ঞেস করল ছেলেটা। ভদ্রলোক বোধহয় কিছুটা বিস্মিত হলেন। একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন ছেলেটার দিকে। যেন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কিছু নিরীক্ষণ করলেন। তারপর অনুমতি দিলেন ছেলেটাকে খেলতে।

এতক্ষণে হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে। নিমেষের মধ্যে দৌড়ে গেল ছেলেটা মাঠের মধ্যে। ছেলেগুলো এবার ফিরে তাকাল নবাগতের দিকে। বিরক্তিতে ভ্রুগুলো কুঁচকালো তাদের। এই বাচ্চা ছেলেটা খেলবে তাদের সঙ্গে! তাহলেই হয়েছে। ব্যাট ধরতে জানে কিনা কে জানে। তাই আবার তারা মন দিল নিজেদের খেলায়। এবার এগিয়ে এলেন সেই কোচ ভদ্রলোক। নিজে থেকে একটা ব্যাট তুলে নিয়ে বাড়িয়ে দিলেন ছেলেটার দিকে। যারা খেলছিল তাদের একজনকে ডেকে বল করার নির্দেশ দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন তিনি। আবার হাসি ফুটল ছেলেটার মুখে। বীরদর্পে এগিয়ে গেল সে ক্রীজের দিকে। ব্যাট হাতে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। তারপর, পাক্কা পঁয়তাল্লিশ মিনিট ক্রীজে দাঁড়িয়ে ব্যাট ঘোরাল ছেলেটা। ছেলেটার প্রতিটা মারের ভেতর দিয়ে ফুটে উঠল নিখুঁত স্টাইলের ছাপ। বিশেষ করে তার তুলনাহীন কভার আর অন ড্রাইভগুলো দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল বাকী ছেলেগুলোর। এইবার ব্যাট রেখে আস্তে আস্তে এগিয়ে

গেল সে কোচ ভদ্রলোকের দিকে। দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মাঝে টেনে নিলেন ছেলে-টাকে তিনি। বারবার পিঠ চাপড়িয়ে ছেলেটাকে অভিনন্দন জানালেন। যাবার আগে পরের দিন থেকে রোজ আসার জন্যও বলে দিলেন তিনি।

এর ঠিক তিন বছর পরের কথা। ১৯২০ সাল। গ্লস্টারশায়ারের হয়ে নটিংহাম-শায়ারের বিরুদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় আবির্ভূত হল ছেলেটা মাত্র সতের বছর বয়সেই। ব্যাট করার সময় আবার দেখা গেল ছেলেটার সেই চোখজুড়োনো মারগুলো। কভার ড্রাইভ, অন ড্রাইভ, লেট কাট, আর মাঝে মাঝে এগিয়ে গিয়ে অফ-স্টাম্পের বাইরের বলগুলোকে সজোরে পিটিয়ে বাউণ্ডারীতে পাঠান দেখে বিস্মিত

দু'হাত বাড়িয়ে বুকের মাঝে টেনে নিলেন ছেলেটাকে তিনি।

হয়ে গেল সারা মাঠ। মাত্র চল্লিশ মিনিট ব্যাট করার সুযোগেই ৯০ রান করে ফেলল ছেলেটা। সেই সঙ্গেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পাকাপাকিভাবেই ভিত গেড়ে বসল সে। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশ নিয়েছে বলেই চুপ করে বসে থাকল না সে। চেষ্টা করতে লাগল কি করে আরও ভাল খেলা যায় যাতে টেস্ট দলে সুযোগ পাওয়া যায়।

অবশেষে সে সুযোগও একদিন এসে গেল তাঁর। ১৯২৫ সালে অস্ট্রেলিয়া এল ইংলণ্ডে খেলতে। আর সেই সূত্রেই ইংলণ্ডের টেস্ট দলে ঠাঁই মিলল তাঁর। তখন তাঁর বয়স বাইশ। সেই ১৯২৫ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, মানে দীর্ঘ একুশ বছর ইংলণ্ডের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে অংশ নিলেন তিনি। সেই প্রথম দিন যেমন, তেমনি এই দীর্ঘ ছাব্বিশ বৎসরে প্রতিটি খেলায়, সে কি টেস্ট ম্যাচ, কি প্রথম শ্রেণীর খেলা, সবেতেই তিনি রাখলেন তাঁর সেই অনবদ্য স্টাইলের ছাপ। উইকেটে এসে দাঁড়ালে তিনি কখনও এলোমেলোভাবে ব্যাট চালাতেন না। প্রতিটি মার ছিল তাঁর কেতাবী ধরনের। আর তাঁর এই কেতাবী ধরনে খেলাই তাঁকে করে তুলেছিল এত জনপ্রিয়।

দীর্ঘ একুশ বছরের টেস্ট জীবনে রেকর্ড সংখ্যক ৮৫টি টেস্ট ম্যাচে রান করেছিলেন

সাড়ে সাত হাজার। ১৯৩৮ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক। ২২বার টেস্টে সেঞ্চুরী করেছিলেন তিনি। ক্যাচ ধরেছেন ১১০টা। আর টেস্টে উইকেট পেয়েছিলেন ৮৪টা। ছাব্বিশ বছর প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে অংশ নেওয়ার ফাঁকে রান করেছেন পঞ্চাশ হাজারের ওপর। প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তিনি কতগুলো সেঞ্চুরী করেছেন জান? ১৬৭টি সেঞ্চুরী। ১৯৪৭ সালে, চুয়াল্লিশ বছর বয়সে ক্রিকেটের এই সুদক্ষ রূপকার অবসর নেন। ক্রিকেট খেলায় তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, দক্ষতা, এবং সর্বোপরি খেলার কেতাবী ভঙ্গীটি জনপ্রিয়তার সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সম্মান তাঁকে এনে দিয়েছিল। ক্রিকেট-অনুরাগীরা তাঁকে ক্রিকেট খেলায় 'স্টাইলের রাজা' নামে অভিহিত করেছিলেন। সত্যিই, তাঁর মত স্টাইলের খেলা আজ অবধি কেউ দেখাতে পারেননি।

১৯৬৫ সালের অভিশপ্ত ১লা জুলাই মৃত্যু এসে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে তাঁকে পৃথিবীর বুক থেকে। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল বাষট্টি বছর। হারিয়ে গেছেন তিনি সত্যি, কিন্তু অক্ষয় করে রেখে গেছেন যে নামটিকে সেটি হল ওয়ালটার রেজিন্যালড হ্যামণ্ড, দি কিং অব স্টাইল।

ভাববার কথা

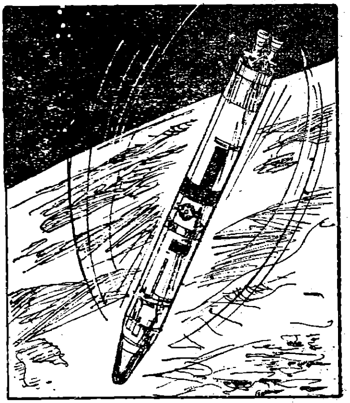

ছবির বস্তুটি একটি রকেট। এর মধ্যে মানুষ নেই। মনুষ্যহীন রকেটটি মহাশূন্যে ডিগবাজি খাচ্ছে, কল বন্ধ করে নিজের গতিতে চলছে, আবার আপনিই কল চালু হচ্ছে। মনে হয় যেন ভূতে চালাচ্ছে। আসলে পৃথিবীতে বসে কল টিপে এটাকে খুশিমত চালান হচ্ছে। ওদেশে ওরা নতুন নতুন আবিষ্কারের আন্দোলনে মশগুল আর এদেশে, মার কাট, বন্ধ কর, দাও বাংলা বন্ধ্। ওরা চলুক আমরা বন্ধ করি।

পুতুলপুরীর রূপকথা

নির্মলেন্দু রায়চৌধুরী

অনেক—অনেক বছর আগেকার কথা। আমাদের এদেশেরই কোন এক অঞ্চলে দুজন দারুশিল্পী বাস করতো। দুই সহোদর—প্রাণধর আর রাজ্যধর। দু'ভাইই ছিল আশ্চর্য ক্ষমতাশালী। অসুরদের সেই বিখ্যাত কারিগর ময়দানবের মতো এরা দু'ভাইও তুচ্ছ কাঠ খড় অথবা সামান্য কোন ধাতু দিয়ে ইচ্ছামতো সব কল্পনাতীত কলের জিনিস তৈরি করতে পারতো। সত্যিই তারা অসাধারণ গুণবান্ ছিল।

প্রাণধর যখন অগ্রজ তার ক্ষমতার কথাটা আগে বলি। প্রাণধরের গুণের অন্ত ছিল না ঠিকই, কিন্তু তার একটা বড় দোষও ছিল। সে ছিল অত্যন্ত বেহিসেবী, উড়নচণ্ডে প্রকৃতির। ফলে, যা হবার তাই হলো। অল্পদিনের মধ্যেই তাদের স্বর্গত পিতার সঞ্চিত সমস্ত অর্থ তার হাত থেকে কর্পূরের মতো উবে গেল।

ক্রমে পরিবারটি নিতান্ত দুরবস্থায় পড়ে। তাদের দিন আর চলে না। পরিবারের অতগুলো লোকের মুখে দু'বেলা দুটি অন্ন তুলে দেবার পথ প্রাণধর আর খুঁজে পায় না। প্রচণ্ড অভাবের তাড়নায় সে দিশেহারা হয়ে ওঠে।

এমন সময় প্রাণধরের মাথায় একদিন এক কূটবুদ্ধি খেলে যায়। সে যেন আকস্মিক ভাগ্য পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেখতে পায়। আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

প্রাণের তাগিদে প্রাণধর আর সময় নষ্ট করে না। অনেক পরিশ্রম করে একদিন সে দুটি আশ্চর্য কাঠের পাখী তৈরি করে—দেখতে ঠিক যেন সত্যিকারের দুটি পাখী।

পরের দিন। উৎফুল্ল প্রাণধর রাতের অন্ধকারে সেই পাখী দুটির কল টিপে দিয়ে অধীর আগ্রহে বাড়ির ছাদে অপেক্ষা করতে থাকে।

আশ্চর্য, পাখী দুটি সহজভাবেই উড়ে যায়। তারা নির্দিষ্ট পথে উড়ে গিয়ে এক-সময় খোলা জানালার ভেতর দিয়ে রাজভাণ্ডারের কক্ষটিতে প্রবেশ করে। তারপর পাখী দুটি তাড়াতাড়ি মুখের মধ্যে মূল্যবান্ মণিমুক্তা যথাসম্ভব পুরে আবার সেই পথেই প্রভুর বাড়িতে ফিরে আসে।

অমনিভাবে পাখী দুটি ফিরে আসাতে প্রাণধরের প্রাণে আনন্দের সীমা থাকে না। বিপদের আশঙ্কা করে ছোটভাই তাকে সতর্ক করে। কোন ফল হয় না। প্রাণধরের প্রলোভন বেড়ে চলে।

প্রতি রাত্রে তার ইঙ্গিতে যন্ত্রের পাখী দুটি প্রহরীদের সতর্ক নজর এড়িয়ে রাজ-

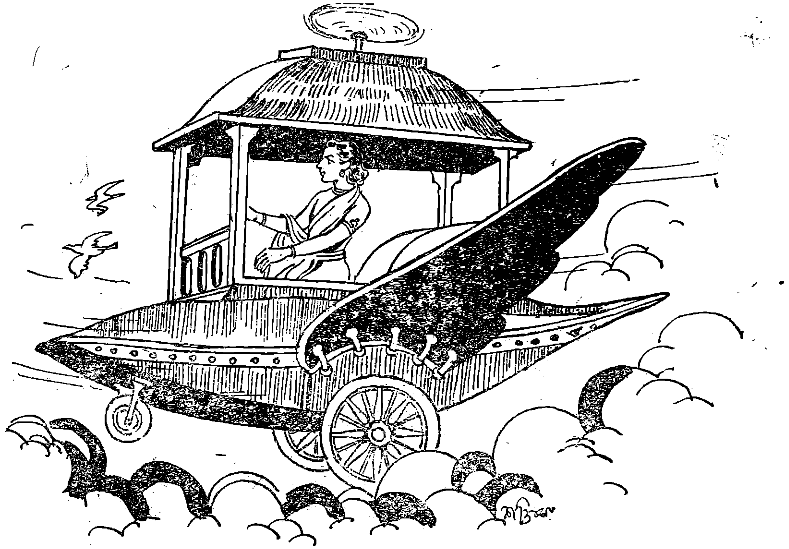

সেও তার তৈরী অনুরূপ একটি রথে চড়ে···

ভাণ্ডার থেকে মণিমুক্তা চুরি করে এনে প্রাণধরকে উপহার দিতে থাকে। এমনিভাবে প্রাণধরের ভাগ্যপরিবর্তন হতে দেরি হয় না। আর সেই অপহৃত ঐশ্বর্যের দৌলতে পরিবারটির দিন পরম সুখেই কাটতে থাকে।

প্রাণধরের বরাতে ঐ সুখ কিন্তু বেশীদিন সইলো না। একদিন মণিমুক্তা সমেত পাখী দুটি রাজভাণ্ডার থেকে বেরিয়ে আসবার পথে হঠাৎ কল বিগড়ে যায়। ফলে, পাখী দুটি মুখ থুবড়ে জানালার বাইরে পড়ে যায়।

ভোর হতে ভূলুণ্ঠিত পাখী দুটির বিস্ফারিত ঠোঁটের দিকে প্রহরীদের নজর পড়তে তারা বিস্ময়ে হতবাক্ হয়। এতদিনে রহস্যময় চোর দুটি প্রহরীদের হাতে ধরা পড়ে।

এই অঘটনের খবর প্রাণধরের কানে পৌঁছুতে তার চৈতন্য হয়। আর কালবিলম্ব না করে চতুর প্রাণধর প্রাণের দায়ে স্ত্রী-পুত্রসহ তার নিজের তৈরী রথটিতে চেপে মুহূর্তের মধ্যে আকাশপথে মিলিয়ে যায়। ভীত রাজ্যধরও সময় নষ্ট করে না। সেও তার তৈরী অনুরূপ একটি রথে চড়ে বহুদূরে এক অজানা অদ্ভুত দেশে পালিয়ে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়। রাজার বিশ্বস্ত অনুচরগণ অনেক চেষ্টা করেও এই দারুশিল্পী ভ্রাতৃদ্বয়ের আর নাগাল পায় না।

শেষ পর্যন্ত প্রাণধর কোথায় গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল আমার জানা নেই। তবে অনুজ রাজ্যধরের সন্ধান যখন জানা গেছে, এবার তার মজার কাহিনীটা বলি—

রাজ্যধর তো একাকী এক জনহীন প্রান্তরে এসে আর রথ থেকে নামলো। কিন্তু যতদূর তার দৃষ্টি যায় কোথাও একটি জনপ্রাণী রাজ্যধরের নজরে পড়ে না, একটি জন্তু-জানোয়ারও না। সে মহা ভাবনায় পড়ে।

ভাবনার পর আসে ভয়। কি আর করে—অগত্যা সেই তেপান্তরের মাঠের ভেতর দিয়ে রাজ্যধর সতর্কে এগিয়ে চলে। কিছুদূর যেতে সামনে এক রাজপথ তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই সঙ্গে তার ভয়ও দূর হয়।

রাজ্যধর ভাবে, পথের সন্ধান যখন পাওয়া গেছে তাহলে অদূরে অবশ্যই কোন বড় নগর আছে; আর সেখানে নিশ্চয়ই তার কোন নিরাপদ্ আশ্রয় মিলবে। সে রাজপথের দিকে দ্রুত পা বাড়ায়।

আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে সামনে সাত সারি সোনার প্রাসাদ রাজ্যধরের নজরে ভেসে ওঠে। সে খুশিতে উচ্ছল হয়। রাজ্যধর ধরে নেয়, এটি নিশ্চয়ই এ রাজ্যের রাজার প্রাসাদ। সঙ্গে সঙ্গে সে স্থির করে, কোনপ্রকারে একবার ঐ রাজপুরীর এলাকায় প্রবেশ করতে পারলে হয়, তারপর ভৃত্য অনুচরদের সঙ্গে ভাব করে তাদের সঙ্গে নিশ্চিন্ত আরামে দিন কাটাতে অসুবিধা হবে না।

ক্রমে চারিদিকে রাতের অন্ধকার নেমে আসছিল। রাজ্যধরও ততক্ষণে গুটিগুটি রাজপ্রাসাদের এলাকায় প্রবেশ করে।

এবার তার অবাক্ হবার পালা। সেই প্রাসাদমালার আঙ্গিনার মাঝখানে পৌঁছুবার পরও একটি জনমানবও রাজ্যধরের নজরে পড়ে না। এখন উপায়? বিমূঢ় রাজ্যধর একটি প্রাসাদে উঠেই পড়ে। তারপর ভয়ে ভয়ে এদিক্ ওদিক্ উঁকি দিতে থাকে। না, কোথাও একটি লোকের ছায়াও সে দেখতে পায় না।

রাজ্যধরের এবার কৌতূহল বেড়ে যায়। একে একে প্রত্যেকটি প্রাসাদে উঁকি দিতে দিতে একসময় সে আসল প্রাসাদটিতে এসে হাজির হয়। অবাক্ বিস্ময়ে সে লক্ষ্য করে, শুধু রাজার সিংহাসনটিই নয়, রাজার উপযুক্ত সমস্ত জিনিসপত্রে গোটা প্রাসাদটা পরিপূর্ণ, কেবল কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই।

একে তখন অনাহারে ক্লিষ্ট তায় শ্রান্তিতে তার দেহ মন অবসন্ন। রাজ্যধর আর ভাবতে পারে না। রাতও কম হয়নি। ওদিক্ থেকে শূন্য রাজশয্যাটি ক্লান্ত রাজ্যধরকে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। পায়ে পায়ে রাজ্যধর একসময় সেই মনোরম শয্যায় উঠে পড়ে গা এলিয়ে দেয়। আঃ কি আরাম! নিমেষে রাজ্যধরের চোখে যেন রাজ্যের ঘুম নেমে আসে।

শুধুই তন্দ্রা। ঘুম হয় না। হবে কি করে? তার পেট যে শূন্য। সে স্বপ্নে দেখে, কে একজন দেবতা তার সামনে দাঁড়িয়ে স্মিতমুখে বলছেন,—কোন ভয় নেই। তুই এখানেই

থেকে যা। এ সবকিছুর মালিক তুই হবি। খাবার? কিছু চিন্তা করিস না—এই প্রাসাদের দক্ষিণের ঘরটিতে গিয়ে তুই মনে মনে যখন যা চাইবি সঙ্গে সঙ্গেই তা তোর সামনে এসে হাজির হবে। অন্য কোথাও যাসনি।

পরপর তিনবার এই অদ্ভুত স্বপ্ন দেখে রাজ্যধরের তন্দ্রা ছুটে যায়। সে লাফিয়ে উঠে পড়ে। তখন তার পেটে অসহ্য ক্ষুধা। তাই সে একটু চিন্তা করে পায়ে পায়ে সেই দক্ষিণের ঘরটিতে গিয়ে হাজির হয়। কিছুক্ষণ সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর একটু ইতস্ততঃ করে একসময় তার অজান্তেই বুঝি সে দু' একটি সুখাদ্য কামনা করে।

কী অবাক্ কাণ্ড! সে যা চেয়েছিল সঙ্গে সঙ্গে ঠিক সেই সন্দেশ আর রসগোল্লা সুন্দর সুন্দর থালায় করে কোথা থেকে মুহূর্তের মধ্যে তার সামনে এসে হাজির হয়। রাজ্যধর পেট পুরে সে সব মিষ্টি চটপট খেয়ে নেয়। সত্যিই সে সব মিষ্টির কী অপূর্ব স্বাদ! খেয়েদেয়ে রাজ্যধর আবার সেই রাজশয্যায় গিয়ে শুয়ে পড়ে। এবার সে অঘোরে ঘুমোয়।

পরের দিন। সূর্যের আলো চোখে পড়তে রাজ্যধরের ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন তার দেহ-মনে আর কোন ক্লান্তি ছিল না। ঐ আরামদায়ক শয্যাটিতে রাজ্যধর আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকে। কী আরাম! শুয়ে শুয়েই সে স্থির করে, প্রথমে রাজপুরীর গোটা এলাকাটা একবার ভাল করে দেখে নেওয়া দরকার।

এলাকাটা ঘুরে সে ভাল করেই দেখে নিল। দেখলে, অনুচর-পরিচর, দাস-দাসীদের চমৎকার চমৎকার ব্যবস্থা আছে। এমন কি হাতীশালা ঘোড়াশালা ক'টিও দেখবার মতো। কিন্তু সব কিছুই শূন্য—কোথাও একটি জনপ্রাণী নেই। অদ্ভুত!

রাজ্যধর চিন্তিতমনে প্রাসাদে ফিরে এসে সিংহাসনে বসে। ক্রমে সে চিন্তায় ডুবে যায়। কিন্তু বেশীক্ষণ নয়। হঠাৎ তার মুখে খুশির আভাস ফুটে ওঠে। খাবারের যখন চিন্তা নেই আর হাতেও অফুরন্ত অবসর—সুনিপুণ শিল্পী রাজ্যধরের ঐ সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজে পেতে দেরি হয় না। সে মনের খুশিতে সিংহাসনে গা এলিয়ে দেয়।

অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যধর বেশ কিছু নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-যুবক, সৈন্যসামন্ত সৃষ্টি করে, হাতী ঘোড়া ইত্যাদিও বাদ যায় না। এরা সকলেই স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা কাজকর্ম করে। শুধু কেউ কথা বলে না। তারা নীরবে সব কিছু করে যায়। তারা কথা বলবে কি করে? সকলেই যে কাঠের তৈরী—কলের পুতুল।

তা হোক। এদের নিয়ে রাজ্যধরের সুখে দিন কাটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে তার আকাঙ্ক্ষা বেড়ে যায়। ভাবে, এখন যখন সে দস্তুরমতো একজন রাজা তখন একজন রানী না হলে কি আর চলে? রাজ্যবিস্তারেও তার মনে সাধ জাগে।

রাজ্যধর একদিন হাসতে হাসতে রাজকন্যাকে প্রশ্ন করে,—

যেমন ভাবনা তেমনি কাজ। চতুর রাজ্যধর সময় নষ্ট করে না। একদিন তার সৈন্য-সামন্ত নিয়ে হঠাৎ প্রতিবেশী রাজ্যটি আক্রমণ করে বসে। এই আচমকা আক্রমণের জন্য সে-রাজা প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে, যা হবার তাই হলো। পরাজিত রাজা রাজ্যধরের কাছে বশ্যতা স্বীকার করলেন। রাজ্যধরের তুষ্টির জন্য তিনি তাকে অনেক কিছুই দিতে চাইলেন। রাজ্যধর কিন্তু কিছুই গ্রহণ করলো না, শুধু রাজকন্যাটিকে বিয়ে করে নিজের রাজ্যে ফিরে আসে। রাজ্যধরের ইচ্ছায় রাজকন্যা একাকীই আসে তার সঙ্গে, তৃতীয় কোন মানুষ ওদের সঙ্গে আসে না।

ক'দিন পরের কথা। রাজ্যধর একদিন হাসতে হাসতে রাজকন্যাকে প্রশ্ন করে,—হ্যাঁগো, তুমি বললে না তো আমার রাজপুরী তোমার কেমন লাগছে—এখানে তোমার কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না?

—ভালই তো লাগছে এই নিরিবিলি পরিবেশে। তোমার এখানে ভাল লাগার বিশেষ কারণটি হচ্ছে—দাস-দাসী সকলেই বেশ অনুগত। ওরা নীরবে সব কিছু করে, কেউ কাজ করতে কখনও বিরক্তি প্রকাশ করে না। রাজকুমারীর কণ্ঠে খুশির আভাস।

—তা হতেই হবে। ওরা যে সব আমার সৃষ্টি। ওরা তো আর মানুষ নয়—সব কলের পুতুল। রাজ্যধরের কণ্ঠে আত্মপ্রসাদের সুর।

তার উক্তি শুনে রাজকুমারী প্রায় আর্তনাদ করে ওঠে। বলে,—অ্যাঁ! এরা কেউই মানুষ নয়—সবই নিষ্প্রাণ, কলের পুতুল? এদের কারুর কোন অনুভূতি নেই?

রাজ্যধর রাজকন্যাকে বোঝাবার চেষ্টা করে। কোন ফল হয় না। আদ্র কণ্ঠে রাজকুমারী বলে,—না কিচ্ছু শুনতে চাই না। এ অসহ্য। আমি আর এক মুহূর্তও এ পোড়া রাজ্যে থাকবো না।

বিভ্রান্ত রাজ্যধর কাতর কণ্ঠে মিনতি করে,—দোহাই তোমার, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। বল, তুমি কি চাও! কি হলে তুমি খুশী হবে? আমি তাই করবো। তুমি যেও না, লক্ষ্মীটি!

—তাহলে দয়া করে তুমি এক্ষুণি তোমার এই কলের পুতুলগুলি দূর কর। এ রাজ্যে মানুষ আনো—অনেক অনেক সত্যিকারের মানুষ। কি জান, যে-রাজ্যে জনমানব থাকে না সে-রাজ্য অবাঞ্ছিত, নিতান্ত অর্থহীন। মানুষের অভাব যন্ত্র কখনও পূর্ণ করতে পারে না।

রাজকুমারীর কথা শুনে রাজ্যধরের মোহভঙ্গ হয়। সে উপলব্ধি করে—সবার ওপর মানুষ সত্য। রাজ্যধর রাজকন্যার প্রস্তাব খুশী মনে মেনে নেয়। তারপর অল্পদিনের মধ্যেই রাজ্যধরের রাজ্যটি সত্যিকারের মানুষে ভরে ওঠে।

জামসেদপুর নিবাসী শ্রীসত্যমোহন ঘোষাল ও শ্রীমতী শান্তি দেবী তাঁদের দ্বিতীয় পুত্র ৺ষষ্ঠী ঘোষালের অকালমৃত্যুতে তার পুণ্য স্মৃতিরক্ষাকল্পে আমাদের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার প্রস্তাব করেছেন। তাঁদের প্রস্তাব অনুসারে আমরা

"৺ষষ্ঠী ঘোষাল স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"

নামে একটি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা আহ্বান করছি।

প্রতিযোগিতার বিষয়বস্তু ঃ

দুঃসাহসিক কাহিনী

রচনা পাঠাবার শেষ তারিখ ঃ ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। প্রতিযোগিতার ফলাফল ও পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা আগামী শ্রাবণ ১৩৭৯ সংখ্যা শুকতারায় প্রকাশিত হবে।

প্রথম পুরস্কার দশ টাকা ● দ্বিতীয় পুরস্কার পাঁচ টাকা

বাংলার দুলাল মহীপাল

শ্রীমধুসূদন মজুমদার

"ভারতের দ্বারে যখন চরণাঘাত করছে গজনীর সুলতান, তখন কি মগধসম্রাটের উচিত গৌড়বঙ্গ নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকা?"—তিক্ত ভৎসনা স্পষ্টভাষী দূতের মুখে।

সিংহাসনে বসে আছেন ভাষাহীন মহীপাল, নতশির, বিষণ্ণনেত্র। সভাসদেরা একবার সম্রাটের দিকে তাকায় করুণভাবে, আর একবার সুস্পষ্ট রোষদৃষ্টি হানে অভব্য দূতটার পানে। লোকটা ভেবেছে কী? দূতের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে—এটা অবশ্যই রাজন্যসমাজে চিরদিন স্বীকৃত, কিন্তু তার বদলে এটুকুও কি আশা করা যেতে পারে না যে দূতেরাও অশালীন উদ্ধত উক্তি থেকে বিরত থাকবেন রাজ্যান্তরে গিয়ে?

সম্রাট্ মাথা তুললেন অবশেষে, সংযত গম্ভীর স্বরেই কথা কইলেন, যদিও পাটলিপুত্রের সেই অতিবৃহৎ ঐতিহাসিক সভামণ্ডপে—যেখানে একদিন গ্রীকসম্রাট্ সেলুকসের দূতও মাথা তুলে কথা কইতে সাহস পান নি—একটু উঁচু পর্দায় চড়া সুরে কথা না কইলে দূরে দূরে কোণে কোণে সমাসীন বা দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা সে-স্বর শুনতেই পান না।

সম্রাটের মুখ নড়ছে, অথচ কথা শোনা যাচ্ছে না, এ-অবস্থাটা ধৈর্য ধরে সহ্য করা সম্ভব হল না ঐসব ব্যক্তির পক্ষে। তারা সমুখে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠল। একটা ঠেলাঠেলি। একটা অর্ধস্ফুট গোলমাল।

সম্রাট্ যা বলতে চেয়েছিলেন, তা অসমাপ্ত রেখেই অঙ্গুলি তুলে দূতের দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষণ করলেন—দূতের মুখে দেখা দিল বিদ্রূপের হাসি।

সম্রাট্ও হাসলেন—সে-হাসি কান্নার চাইতেও করুণ—"যে-সম্রাট্ নিজের সভাকক্ষে গোলমাল থামাতে পারে না, সে রুখবে সুলতান মামুদকে ?"

দূত এরকম নগ্ন স্বীকৃতি আশা করে নি সম্রাটের মুখ থেকে। হঠাৎ লাগসই জবাব দিতে পারল না এর। মুখে ফুটে উঠল একটা অপ্রতিভ ভাব, তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—"বাস্তবিকই বড় পরিতাপের বিষয়—ঐ ভদ্রমহোদয়দের এই অসংযম—"

"এ-অসংযম ওঁরা গোড়ায় কিন্তু আপনাদের কাছেই শিখেছেন"—একটা আকস্মিক জ্বালা যেন হাউইয়ের মত ফেটে বেরুল সম্রাট্ মহীপালের মুখ থেকে।

দূত হতচকিত, কিছু-বা অসন্তুষ্টও—তোতলার মত থেমে থেমে অতিকষ্টে উচ্চারণ করল—"কীরূপ আজ্ঞা করছেন সম্রাট্ ? আমাদের কাছ থেকে ? আমাদের সঙ্গে কী যোগাযোগ আছে আপনার প্রজাদের, বুঝতে পারলাম না !"

সম্রাট্ তীক্ষ্ণভাষায় উত্তর দিলেন—"বুঝতে পারবেন, চেষ্টা করলেই। সমস্ত উত্তর ভারত একদিন ছিল মগধসাম্রাজ্যেরই ছত্রছায়াতলে। হিন্দুকুশ পর্যন্ত। বেশীদিন আগের কথাও বলি নি—মানেন ?"

"তা, সম্রাট্ বিগ্রহপালের সময় পর্যন্ত আমরা সবাই—হাঁ—তা ত বটেই—" দূত বুঝতে পারে না কথার মোড় কোন্ দিকে ঘোরাতে চাইছেন সম্রাট্।

প্রতিহারীদের চেষ্টায় সভার গোলমাল তখন থেমেছে, সম্রাট্ও, বোধহয় ব্যক্তিগত উত্তেজনার বশেই, একটু উঁচু গলায় কথা কইতে শুরু করেছেন—তাঁর উক্তিগুলি তীক্ষ্ণমুখ তীরের মত চারিদিকের দেয়ালে দেয়ালে আমূল বিঁধে যাচ্ছে যেন।

সম্রাট্ বলছেন—"হাঁ, ছিলেন আপনারা আমাদেরই সাম্রাজ্যের ভিতরে। হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র, হিমালয় থেকে নর্মদা পর্যন্ত যত রাষ্ট্র আছেন—সবাই। তখন এ-সাম্রাজ্যের শক্তি এমন ছিল যে একশোটা গজনীর মামুদ একসাথে ভারতের দ্বারে এসে হানা দিলেও সম্রাটেরা তা ফুৎকারে উড়িয়ে দিতে পারতেন—"

সম্রাট্ এক মুহূর্ত নিস্তব্ধ—সভাগৃহে একটা সূচ পড়লে তার শব্দ শোনা যায়, সভাজনেরা উদ্গ্রীব হয়ে সম্রাটের প্রত্যেকটা কথা যেন গিলছে। আর দূত ? সে তটস্থ। কী-বজ্র সম্রাট্ তার মাথায় নিক্ষেপ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন, তা এখনও সে আন্দাজ করে উঠতে পারে নি।

সম্রাট্ যা বললেন, তা ধ্বনিত হল একটা নৈরাশ্যের হাহাকারের মত—"আপনারা সে সাম্রাজ্য ভেঙে টুকরো টুকরো করলেন—টুকরো টুকরো—"

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলে না—সম্রাট্ই তার পরে ক্লান্ত, হতাশ কণ্ঠে বললেন—"আজ আপনারা আমার কাছে এসেছেন মুসলিমবিরোধী শক্তিসংঘ

গড়ে তুলবার জন্য। সুদৃঢ় দুর্গ ভেঙে ফেলে দিয়ে তার পরে এসেছেন বনেবাদাড়ে পাথর কুড়োবার জন্য। কী? না, পাথর কুড়িয়ে কুড়িয়ে খেলার কেল্লা গড়বেন একটা—"

দূত এতক্ষণে মাথা তুলল—"আমরা সবাই স্বাধীন হয়েছি, সেটা কি একটা অপরাধ? স্বাধীনতা ত জন্ম-অধিকার প্রত্যেকেরই—"

সম্রাট্ তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন—"ঠিক কথা। খুবই ঠিক কথা। স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান্ মানুষই নিজের সমাজ বা নিজের রাষ্ট্রকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় না স্বাধীন হওয়ার জন্য। আদিম মানব ছিল বন্য বর্বর, বনেজঙ্গলে পরিপূর্ণতম ছিল তার স্বাধীনতা। কিন্তু সভ্য হওয়ার তাগিদে সেই পরিপূর্ণতম স্বাধীনতার একাংশ সে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়েছিল, নিজেরই ভালোর জন্য যেচে নিয়েছিল বন্ধন—পারিবারিক বাঁধন, সামাজিক বাঁধন, রাষ্ট্রিক বাঁধন—

"আপনারা রাষ্ট্রিক বাঁধন ছিন্ন করে ভারতের অখণ্ডতা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। এখন আর ভারত বলে কিছু নেই, আছে উদভাণ্ডপুর, আছে তক্ষশিলা, আছে থানেশ্বর, কনোজ, মগধ, গৌড়বঙ্গ। ভারত ছিল এক, এঁরা হয়েছেন অনেক। এই অনেককে মিলিয়ে মুসলিমপ্লাবন রোধ করার চেষ্টা—"

দূত এতক্ষণে কথা বলবার সুযোগ পেল, রুষ্টভাবে বলল—"এ চেষ্টা কি হাস্যকর মনে হচ্ছে সম্রাটের?"

"ঠিক ততখানিই হাস্যকর মনে হচ্ছে, ক্ষুদ্র মগধের রাজাকে সম্রাট্ বলে সম্বোধন করা যতখানি হাস্যকর। শুনুন দূত, উদভাণ্ডপুরের শাহীরাজা অনঙ্গপাল বীর এবং সুযোদ্ধা। তাঁকে আমি শ্রদ্ধা করি। কিন্তু তাঁর সাহায্যে আমি সৈন্য পাঠাতে পারি না এই মুহূর্তে, কারণ আমার নিজের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে তাহলে। গৌড় ছিল আমার পিতৃভূমি, সেই গৌড়ই এখন আমার করচ্যুত হয়েছে। সেখানে রাজত্ব করছেন নতুন এক রাজবংশ, তাঁদের লোলুপ দৃষ্টি মগধ-সিংহাসনের উপরে।

"আমি যদি আমার দশ হাজার সৈন্য—বলতে কি দশ হাজারের বেশী সৈন্যই আমার নেই, উদভাণ্ডপুরে পাঠাই সাতশো ক্রোশ ব্যবধানে, তার পরদিনই অরক্ষিত মগধের ঘাড়ে এসে পড়বে গৌড়েশ্বরের আক্রমণ। উদভাণ্ডপুরের শাহীরাজাকে সাহায্য করতে গিয়ে মগধের মহীপাল যাবে বিলুপ্ত হয়ে। ও বিলাসিতা আমার মত দুর্বলের জন্য নয় দূত!"

শাহীদূত বিদায় হল। মগধ সীমান্ত পেরুবার পরে তারস্বরে সে যত্রতত্র ঘোষণা করতে লাগল যে মগধের মহীপালের মত সংকীর্ণচেতা স্বার্থপর রাজা ভূভারতে দ্বিতীয় আর একটি নেই। সে রটনার প্রতিধ্বনি পাটলিপুত্রে বসেই শুনতে পেলেন মহীপালদেব, বিষণ্ণ হাস্যে মনকে প্রবোধ দিলেন—"এ আমার বিধিলিপি।"

ও বিলাসিতা আমার মত দুর্বলের জন্য নয় দূত !" [পৃষ্ঠা ১৯৫

সুলতান মামুদ সৈন্য সাজাচ্ছেন পররাজ্য গ্রাসের জন্য, মহীপালদেবও সৈন্য সাজাচ্ছেন একই সময়ে, কিন্তু পররাজ্যে হামলা করার উদ্দেশ্যে নয়, নিজের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য। শয়নে স্বপনে তাঁর এক চিন্তা—গৌড়বরেন্দ্রী রাঢ়বঙ্গ কেমন করে তিনি নিজের অধিকারে আনবেন। ও যে তাঁর পিতৃভূমি, ওর প্রতি কণা ধূলিতে যে তাঁর পূর্বপুরুষদের দেহভস্ম মিশে আছে রেণু রেণু হয়ে।

অবশেষে একদিন সময় এলো। বর্মা রাজা বিতাড়িত হলেন গৌড় থেকে, চন্দ্র রাজা সূক্ষ্ম থেকে। নৈরাজ্যপীড়িত বরেন্দ্রীতে প্রতিষ্ঠিত হল মহীপালের সুদৃঢ় শাসন, কিন্তু কঠিন প্রতিরোধের সম্মুখে পড়তে হল তাঁকে পূর্ববঙ্গের নদীনালার গোলকধাঁধায়। সেখানে রাজা গোবিন্দচন্দ্র যে জলব্যূহ রচনা করে বসে আছেন, তা ভেদ করবার মত নৌবল মহীপালের নেই।

মহীপাল সখেদে উপলব্ধি করেন—তিনি মহীপাল মাত্র, ধর্মপাল বা দেবপাল নয়, সমুদ্র ছিল যাঁদের রাজ্যাধিকারের পরিখা। তিনি আপাততঃ বঙ্গাভিযান বন্ধ রেখে পশ্চিমপানে ছুটিয়ে দিলেন তাঁর সেনাবাহিনীকে। কোশল, কাশী, কনোজ, মালব, থানেশ্বর—সেদিনও এঁরা পালসাম্রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিলেন। মহীপালের দাবি এইটুকু মাত্র যে তাঁরা আবার সেই সাম্রাজ্যের ভিতরে ফিরে আসুন।

তাতে মগধের চেয়ে ভারতের মঙ্গল বেশী। আবার যদি সমগ্র উত্তর ভারত একটা মাত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার ভিতরে সম্মিলিত হয়, সুলতান মামুদের সাধ্য হবে না

স্ব-প্রতিরক্ষার অঙ্গে দন্তস্ফুট করতে। এর বিনিময়ে মগধের প্রত্যাশা শুধু সেইটুকু আর্থিক সহযোগিতা যা একান্ত দরকার সেই রক্ষাবাহিনী গড়ে তুলবার জন্য।

কেউ কেউ প্রশ্ন তুলল—সে রক্ষাবাহিনী মগধকেই কেন গড়তে হবে? শাহী-রাজাদের কেন তা গড়তে দেওয়া হবে না? কেন হবে না থানেশ্বর বা কনোজকে? বা অন্য কাউকে? বিধিদত্ত কোন্ অধিকার নিয়ে মগধ পয়দা হয়েছে ভারতের পূর্বাঞ্চলে?

মহীপালের তরফ থেকে সংগত উত্তরই সেদিন দেওয়া হয়েছিল এ-প্রশ্নের। বলা হয়েছিল—"অধিকারটা আর কিছু নয়—চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং ধর্মাশোক, সমুদ্রগুপ্ত ও বিক্রমাদিত্য চন্দ্রগুপ্ত, ধর্মপাল এবং দেবপালের ঐতিহ্য বলে সর্বভারতের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করার ক্ষমতা একমাত্র ঐ মগধ-রাজধানী পাটলিপুত্রেরই আছে। সর্বভারতের শক্তিকেন্দ্র যদি গড়তে হয় কোথাও, ঐখানে ছাড়া তার উপযুক্ত পীঠস্থান আর কোথাও মিলবে না।"

কোন যুক্তিই কিন্তু অন্তর স্পর্শ করল না কারও।

অগত্যা বাহুবলেই কাশী কোশল ও মালবের পূর্বাংশ মগধসাম্রাজ্যের অন্তভুক্ত করতে হল মহীপালকে। কনোজের উপরে আক্রমণ চালাবার জন্য তিনি প্রস্তুত হচ্ছেন, এমন সময় সুলতান মামুদের সঙ্গে আবার শক্তিপরীক্ষা শুরু হল উত্তর ভারতের।

কনোজ ইতিপূর্বেই শাহীরাজাদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গজনীর আক্রমণে পাঁচ হাজার সৈন্য সাহায্যের পবিত্র প্রতিশ্রুতি। মহীপাল স্বভাবতঃই মনে করলেন সেই বাক্যদানের মর্যাদা অবশ্যই রক্ষা করবে কনোজ। এ-সময়ে তাহলে মগধের দিক থেকে কনোজ আক্রমণ একান্তই পিঠে ছুরি মারার মত ব্যাপার হবে। এমন কাজ পালবংশধর কোন রাজা করতে পারেন না।

কনোজরাজকে তিনি অভয়বাণী পাঠালেন—"আপনি স্বচ্ছন্দে চলে যান শাহীরাজার সাহায্যে। গজনীর সুলতান নিজের দেশে ফিরে না গেলে আমি আর অস্ত্র ধারণ করব না আপনার বিরুদ্ধে—"

মগধের বিজয় বাহিনী ফিরে এল কনোজের সীমান্ত থেকে। সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রচেষ্টা অধপথে রুদ্ধ হল মহীপালদেবের।

কিন্তু মহীপালের পক্ষে এটি হয়ে দাঁড়াল শাপে-বর। পশ্চিম থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে এনে তিনি পূর্বদিকে নিবদ্ধ করবার সুযোগ পেলেন, আর সেখানে এক অকাল কালবৈশাখীর সূত্রপাত দেখে তিনি যুগপৎ বিস্মিত ত্রস্ত হয়ে উঠলেন।

তাঞ্জোরপতি রাজেন্দ্র চোল!

অদ্ভুতকর্মা পুরুষ তিনি দাক্ষিণাত্যের। ক্ষুদ্র কেরলখণ্ডের নৃপতি হয়েও আজ তিনি দাক্ষিণাত্যের সমগ্র পূর্বাংশ নিজের অধিকারে এনেছেন। শুধু তাই নয়, তিনি সিংহল

বিশাল নৌবহরের একটা অংশ পাঠিয়ে দিলেন সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে পূর্ববঙ্গে।

জয় করেছেন। বিশাল নৌবহর গড়ে তুলে পার হয়েছেন বঙ্গোপসাগর, জয় করেছেন সুবর্ণভূমি যবদ্বীপ মালয়, সেখানে আজ সুবিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য তাঁর, আয়তনে যা প্রায় ভারতেরই সমান হবে।

আজ সেই রাজেন্দ্র চোলের সেনাকটক ধাবিত হয়েছে গৌড়বঙ্গের পানে। উদ্দেশ্য ?

না, উদ্দেশ্য সামাজ্যবিস্তার নয়।

এক আজগুবী খেয়াল চেপেছে চোলসম্রাটের মাথায়। গঙ্গাহীন দেশ তাঁর, গঙ্গাজলের অফুরন্ত সরবরাহ সেখানে যাতে পাওয়া যায়, তারই ব্যবস্থা করার জন্য এসেছে এই সেনাদল। তারা স্থায়ী রাজপথ তৈরি করবে গঙ্গাতীর পর্যন্ত। তামিল, কলিঙ্গ এবং সূহ্ম গৌড়ের ভিতর দিয়ে প্রতিদিন জলের চালান যাবে তাঞ্জোরে, শত শত উটের পিঠে।

মহীপালদেব সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন রাজেন্দ্র চোলের কাছে। "আপনাকে আমি গঙ্গাজলের জন্য পথ ছেড়ে দেব নির্বিবাদে। বিনিময়ে—"

রাজেন্দ্র চোলের শ্রদ্ধা ছিল পালরাজাদের উপরে। দেবপালের অধিকার একদিন তাঁর কেরল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, সেকথা তিনি ভোলেন নি। তিনি সন্ধি করলেন, এবং সন্ধির শর্তানুযায়ী তাঁর বিশাল নৌবহরের একটা অংশ পাঠিয়ে দিলেন সুন্দরবনের ভিতর দিয়ে পূর্ববঙ্গে। গোবিন্দচন্দ্র পরাভূত হলেন। তাঁর নৌবহর হল ধ্বংস।

এইটাই ছিল মহীপালের অনুরোধ রাজেন্দ্র চোলের কাছে। গোবিন্দচন্দ্রকে পরাভূত এবং তাঁর নৌবহর বিধ্বস্ত করে চোল জাহাজগুলি সমুদ্রে ফিরে গেল যখন, পালসম্রাটের সেনা গিয়ে প্রবেশ করল নিম্নবঙ্গে।

গঙ্গাজলের নেশা ছুটে গেল অচিরেই রাজেন্দ্র চোলের মাথা থেকে। তাঁর তৈরী রাজপথে উষ্ট্রযূথ আর যাতায়াত করে না জলের জালা পিঠে নিয়ে। সে পথ কাজে লাগছে মগধসাম্রাজ্যের ব্যবসায়ী আর তীর্থযাত্রীদের।

পালরাজাদের পিতৃভূমি সমগ্র গৌড়বঙ্গ পুনরুদ্ধার করে মগধসাম্রাজ্যের সম্পূর্ণতা সাধন করলেন মহীপালদেব। এ-কীর্তি তাঁর আজও চিরস্মরণীয় হয়ে আছে সারা বাংলায়। হেন জেলা নেই বঙ্গদেশে, যার কোন-না-কোন অংশে মহীপালের নামে চিহ্নিত গ্রাম বা শহর, দীঘি বা দেবমন্দির নেই। ধান ভানতে ভানতে মহীপালের কীর্তি গান করত বাংলার নারীরা, এ-প্রবাদ এখনও বাঙ্গালীর মুখে মুখে ফেরে।

অজানিত-তথ্য মাধ্যাকর্ষণ

মাধ্যাকর্ষণ কাকে বলে একথা সবারই জানা। মাধ্যাকর্ষণ আছে বলেই গ্রহ উপগ্রহ বা সারা ব্রহ্মাণ্ড পরস্পরের সঙ্গে অদৃশ্য সূত্রে আবদ্ধ। মানুষ জানে জড়বস্তু পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এই আকর্ষণই মাধ্যাকর্ষণ। বস্তু বড় হলে আকর্ষণ শক্তিও বাড়ে। কিন্তু কি করে এই শক্তির সৃষ্টি হল আজ অবধি কেউ বুঝতে পারেনি। মানুষ অন্য শক্তিগুলি, যথা—উত্তাপ, আলো, বিদ্যুৎও চুম্বক শক্তির সৃষ্টি করতে পারলেও কিন্তু মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৃষ্টি করতে পারে না। তাই মাধ্যাকর্ষণ শক্তি মানুষকে আজও ভাবাচ্ছে।

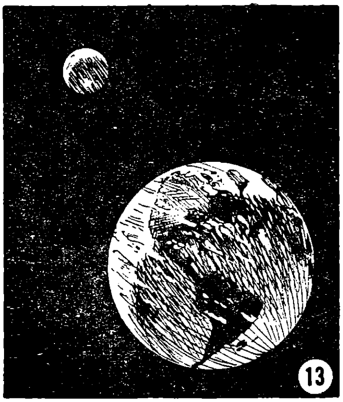

ধৈর্যশীল শিল্পী

লোকটি একজন শিল্পী। গ্রানাইট পাথরে ঊনবিংশ শতাব্দীর একজন রেড ইণ্ডিয়ান বীরের ঘোড়ায় চড়া মূর্তি খোদিত করছেন। ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটিয়ে তাতে ধীরে ধীরে রূপ দিচ্ছেন। সতেরো বছর ধরে তিনি খোদাই করছেন, এখনও কাজের সিকিভাগ এগোননি।

সেয়ানে সেয়ানে

তারকনাথ চৌধুরী

অনেকদিন আগের কথা। ইংলণ্ডে পিটার রজাস নামে একজন ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন। ভদ্রলোক প্রচুর পয়সাকড়ির মালিক হলেও তাঁর মনটি ছিল অত্যন্ত পবিত্র। এককথায় বলতে গেলে অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন পিটার রজাস।

ভদ্রলোকের একটা বাতিক ছিল। যীশু খ্রীষ্ট এবং তৎসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন রকমের চিত্রাদি যা বড় বড় নামী শিল্পীরা এঁকেছিলেন সেগুলিকে তিনি প্রচুর মুল্যের বিনিময়ে দেশবিদেশের বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করে নিজের একটি বিশেষ উপাসনাকক্ষে সাজিয়ে রাখতেন। তাঁর ঐ উপাসনাকক্ষে ছিল মাইকেল এঞ্জেলো থেকে শুরু করে লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, পিকাসো প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ শিল্পীর বিখ্যাত বিখ্যাত চিত্রশৈলী। তাদের মধ্যে মাইকেল এঞ্জেলোর আঁকা 'ভার্জিন মেরী'র চিত্রখানিই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ এবং অত্যন্ত দামী। ঐ প্রাচীন চিত্রখানি বহুকষ্টে অনেকদিনের প্রচেষ্টায় দু'লাখ পাউণ্ডের বিনিময়ে সংগ্রহ করেছিলেন পিটার রজার্স।

আগেই বলেছি পিটার রজার্সের মনটি ছিল অত্যন্ত পবিত্র। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে মনটি ছিল অত্যন্ত কোমল এবং দয়ালু। কেউ যদি বিপদে পড়ে তাঁর কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতো তবে তিনি অকাতরে সাহায্য করতেন তাকে। উইলিয়ম স্মিথ নামে পিটার রজার্সের বাড়ীর কাছে একটি শঠ ছিল। উইলিয়ম স্মিথ পিটার রজাসের ঐ কোমল ধর্মপ্রবণ দয়ালু স্বভাবের কথা জানতো। পিটার রজাসকে ঠকিয়ে একটা মোটা দাঁও মারার মতলবে একদিন পিটার রজাসের কাছে হাজির হলো উইলিয়ম স্মিথ। গিয়ে বললো—কি বলব দাদা, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম মাদার মেরী আমাকে আদেশ দিচ্ছেন আপনার কাছ থেকে আপনার ঐ ভার্জিন মেরীর ছবিখানা নিয়ে আসতে।

পিটার রজার্স তৎক্ষণাৎ প্রত্যুত্তর না দিয়ে উইলিয়ম স্মিথের মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবতে লাগলেন। উইলিয়ম স্মিথ মনে মনে পুলকিত,—যাক চালখানা তাহলে কায়দামাফিকই হয়েছে। মাদার মেরী আদেশ দিয়েছেন—এই কথা শুনে যদি পিটার রজার্স ভার্জিন মেরীর চিত্রখানি তার হাতে তুলে দেয় তবে সেটা বিক্রি করে বেশ কিছু টাকা মিলে যাবে। তাই উৎসাহের আতিশয্যে পিটার রজাসের

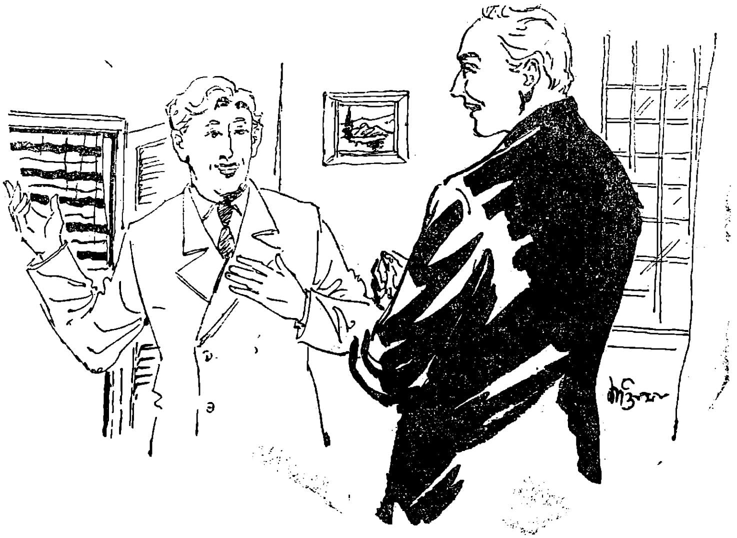

কি বলব দাদা, কাল রাতে স্বপ্নে দেখলাম··· [পৃষ্ঠা ২০০

দিকে হাত বাড়িয়ে ভক্তিগদগদকণ্ঠে উইলিয়ম স্মিথ বললো—আমি তো জানি আপনি মাদার মেরীর আদেশ অমান্য করতে পারেন না, তাই আজ আপনার কাছ থেকে ছবিখানি নিয়ে যেতে এসেছি। ছবিটি তাহলে দিন এবার।

উইলিয়ম স্মিথের সহর্ষকণ্ঠে যেন সংবিৎ ফিরে পেলেন পিটার রজার্স। সহাস্যে বলে উঠলেন—কি আশ্চর্য! মাদার মেরী যে আমাকেও স্বপ্নে দেখা দিয়েছেন। আদেশ দিয়েছেন আমি যেন দু'লাখ পাউণ্ডের বিনিময়ে ছবিখানি আপনার হাতে তুলে দেই।

উইলিয়ম স্মিথের দিকে হাত বাড়ালেন পিটার রজার্স—তা দিন দু'লাখ পাউণ্ড, আমি এক্ষুণি মাদার মেরীর আদেশমত আপনাকে ছবিটা দিয়ে দিচ্ছি।

পিটার রজার্সের কথায় মুহূর্তে চুপসে গেল উইলিয়ম স্মিথ। সে কখনো ভাবতেই পারেনি যে ধার্মিক কোমলস্বভাবের অধিকারী পিটার রজার্স এরকম কথা বলতে পারেন। চালটা যে এমনভাবে ফেঁসে যাবে তা স্বপ্নেও কল্পনা করেনি উইলিয়ম স্মিথ। তাই কোনমতে আমতা আমতা করে একটা উত্তর দিয়েই বেচারী তাড়াতাড়ি ওখান থেকে সরে পড়লো।

---

১৬৬ পৃষ্ঠার ছবির উত্তর

১। কাপড় কাচছে	২। কাপড় শুকোতে দিচ্ছে	৩। ইস্ত্রি করছে

হাঁদা-ভোঁদার
গোয়েন্দাগিরি
এই যে আমাদের পাড়ায় প্রায়ই গরু চুরি হচ্ছে, কে করছে তাকে হাতে নাতে ধরা আমাদের কর্তব্য। কি বলিস ভোঁদা?
সে তো ঠিক কথাই রে হাঁদা!
কিন্তু আমরা কি সেই গরু চোরকে ধরতে পারবো হাঁদা!
তুই পারবি না ঠিকই, কিন্তু এই শর্মা ঠিক ধরে ফেলবে দেখবি। অবিশ্যি তুই আমার অ্যাসিসটেন্ট হিসেবে থাকবি।
সেদিন রাত্রে
দেখেছিস ভোঁদা! হেবোদের গোয়ালঘরে সাদা চাদর মুড়ি দিয়ে কে যেন ঢুকলো! নিশ্চয় সেই ব্যাটা চোর!
কিন্তু হাঁদা!
তোর সব তাতেই খালি কিন্তু! এবার দেখবি ব্যাটাকে কেমন হাতে নাতে ধরে ফেলি! যদি প্রয়োজন হয় খালি একটু হেল্প করবি!
কিন্তু—

লক আপ ইওর কিন্তু ইডিয়েট! তুই এতো ভীতু জানলে তোকে আমার অ্যাসিস্টেন্ট করতাম না! আমি ওকে এ্যাটাক করে কায়দা করার পর খালি একটু হেল্প করবি!
আ-আচ্ছা!
তোমার খেল খতম কিন্তু গরু আর হজম করতে পারবে না! এবার বমাল আমার কাছে আত্মসমর্পণ করো তিন গোণার মধ্যে—এক—দুই—
—তিন! ভেবেছো ঘাপটি মেরে আমাকে ফাঁকি দেবে, এই আমিই স্বয়ং ভেতরে যাচ্ছি তোমাকে ক্যাপচার করতে!
পরমুহূর্তেই
ভোঁদা রে হেল্প!
তুই বলেছিলি, তুই এ্যাটাক করার পর তোকে হেল্প করতে। এখন ওই দেখছি তোকে এ্যাটাক করেছে! কাকে হেল্প করবো হাঁদা? তোকে না ওকে?

ছায়াছবির কথা

পূরবী দেবী

"নড়া ছবি দেখবে? চলা ছবি দেখবে? যদি দেখতে চাও তো ভডেভাইল্ রঙ্গমঞ্চে হাজির হও। দর্শনী মাত্র এক সেণ্ট।"

বিজ্ঞাপনটা বেরিয়েছিল আমেরিকায় নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

বিজ্ঞাপন প্রচার হবার পর থেকেই হাজার হাজার লোক এসে হাজির হল

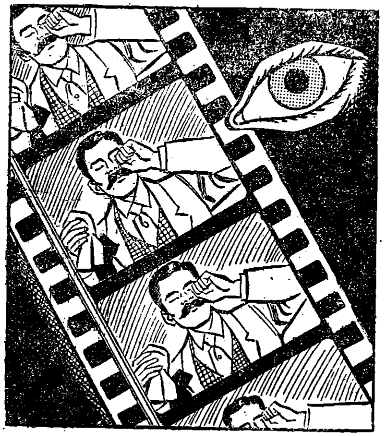

ছবিতে মানুষ নড়ে না। কিন্তু দর্শকে নড়তে দেখে। তার কারণ সিনেমা যন্ত্রে এক সেকেণ্ডে ২৪টা ছবি দেখায়। ক্যামেরা যন্ত্রে একটা ছবির পর আর একটা ছবি আসার আগে আলোর ফলন একটা চাকায় বন্ধ করে দেয়। এইভাবে পর পর দ্রুত ছবির আবর্তনে ছবির মানুষ নড়ছে বলে বোধ হয়। (চিত্র নং ২)

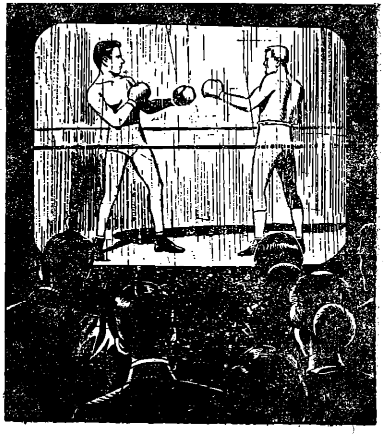

চলচ্চিত্র আবিষ্কার হবার পর এই ছবিটি নিউ ইয়র্ক শহরে ১৮৯৬ সালে দেখান হয়েছিল। পর্দার উপর আলোর কালো রেখা, বৃষ্টি পড়ার মত দেখাচ্ছে। (চিত্র নং ১)

ভডেভাইল রঙ্গমঞ্চের সামনে। দেখতে দেখতে দর্শকের স্থান পূর্ণ হয়ে গেল। তবু বহু দর্শক অপেক্ষা করতে লাগল রঙ্গমঞ্চের বাইরে রাস্তার উপর পরের শো দেখবে বলে।

যেসব দর্শক টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকেছিল তারা চেয়ারে বসে সামনে তাকিয়ে দেখলে চারদিকে কালো পাড়ে ঘেরা এক চৌকোনা সাদা পর্দা টান টান করে সামনে ঝুলছে। সেটা যে কেন ঝুলছে দর্শকরা তা বুঝতে পারেনি। তারা ভাবলে পর্দা উঠলে প্রদর্শনী শুরু হবে।

দর্শকরা নিজের মনে নানা জল্পনাকল্পনা করছে এমন সময় প্রেক্ষাগৃহের সব আলো নিভে গেল আর পর্দার উপর ফুটে উঠল সাদা কালো ছবি। ছবিতে দেখা গেল দুজন মুষ্টিযোদ্ধা পরস্পরের সঙ্গে মুষ্টিযুদ্ধ করছে।

এদিকে ছবির মানুষ ঘুষোঘুষি করছে আর ছবিটাও খুব কাঁপছে, সেই সঙ্গে ছবির উপর সাদা কালো রেখার কম্পন বৃষ্টি পড়ার মত চোখে পড়ছে।

আজকের দিনের তুলনায় সে ছবিটা ছিল হাতে-খড়ি। তবুও দর্শকেরা আনন্দে বিস্ময়ে অবাক্ হয়ে দেখতে লাগল।

ছবিটার নাম দেওয়া হয়েছিল "টমাস এডিসনের আবিষ্কৃত অত্যাধুনিক আবিষ্কার—ভিটাস্কোপ"। (চিত্র নং ১)

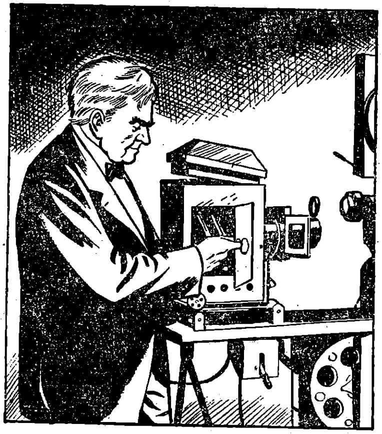

এডিসনের প্রথম তৈরী নড়া ছবি দেখানর যন্ত্র। (চিত্র নং ৩)

ছবিটার নাম দেখেই বোঝা যায় প্রথম সিনেমা আবিষ্কার করেন টমাস এডিসন। সেই সময়ে বহুলোক নড়া ছবির কথা নিয়ে গবেষণা করছিলেন। এডিসনও ভাবতে লাগলেন। ভেবে তিনি দেখলেন যে মানুষ যেভাবে নড়াচড়া করে সেই নড়াচড়ার ছবিগুলি পর পর আলাদা আলাদা তুলে একটার পর একটা যদি তাড়াতাড়ি দেখান যায় তাহলে মনে হবে ছবিটা নড়ছে। কারণ কোন দৃশ্য চোখে পড়ার পর চোখ বুজলেও সেই দৃশ্যের ছাপ চোখের উপর মুহূর্তের জন্য ভেসে থেকে অদৃশ্য হয়ে যায়। অতএব এক সেকেণ্ডের মধ্যে চব্বিশটা ছবি দেখাবার সময়ে একটার পর আর একটা দেখাবার মাঝে যদি মুহূর্তের জন্য অন্ধকার করে দেওয়া যায় তাহলে মনে হবে ছবিটা নড়ছে। (চিত্র নং ২) এইটা বোঝার পর এডিসন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করলেন বাক্সর মত দেখতে। তার চারধার ঢাকা শুধু একধারে লম্বা নলের মত। তাতে লেন্স লাগান। বাক্সর মধ্যে রাখা আলো লেন্সের মধ্যে দিয়ে বাইরে এসে পড়ে ঠিক টর্চ লাইটের মত। সেই বাক্সের মধ্যে

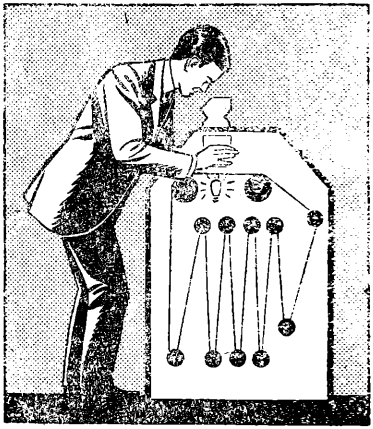

কাইনেটোস্কোপ। এর মধ্যে নড়া ছবি চোখবার যন্ত্রে চোখ রেখে দেখা যায়। (চিত্র নং ৪)

ফ্যানের মত একটা পাখা বসিয়ে দিলেন যাতে ফিল্মটা চলবার সময়ে পাখাটা ঘোরে।

তার ফলে যন্ত্রটার আলো একবার বেরোবে একবার বন্ধ হবে। এইভাবে সেকেণ্ডে চব্বিশবার আলো-অন্ধকার সৃষ্টি হবে।

যন্ত্রটা তৈরি করে এডিসন ফিল্ম বসিয়ে দেখলেন, বাঃ কি তাজ্জব! যন্ত্রের আলো ফিল্মের মধ্যে দিয়ে আসায় ছবিটার ছায়া দেওয়ালে পড়ে ঠিক যেন জ্যান্ত মানুষের মত চলছে। (চিত্র নং ৩)

এইভাবে প্রথম সিনেমা আবিষ্কারের ভিত গাঁথা হল।

আরমাটের তৈরী ম্যাজিক লণ্ঠন বা দেওয়ালে ফেলা ছবি। (চিত্র নং ৫)

সিনেমা আবিষ্কার করে দর্শকদের কাছ থেকে দর্শনী নিয়ে ছবি দেখাবার জন্যে এডিসন প্রথম যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করেছিলেন তার নাম দিলেন কাইনেটোস্কোপ। এই যন্ত্রের মধ্যে দীর্ঘ ফিল্মের ফিতা নানা কাঠিমের উপর ঘুরত। ছবিটা দেখলেই বোঝা যাবে। দর্শক বাক্সের মধ্যে একটা পেনী ফেলে চোখ রাখার চোঙায় দৃষ্টি ফেলে ফিল্ম ঘোরানর হ্যাণ্ডেলটা ঘোরাতে শুরু করলেই বাক্সের ভেতরে ফিল্মগুলি কাঠিমের উপর ঘুরে একে একে আলোর সামনে দিয়ে চলে যেত। দর্শকও নড়া ছবি দেখে আনন্দ পেত। এই সব প্রাথমিক যুগের ছবিগুলি ছিল নর্তকীদের নাচের ছবি কিংবা নানা ভঙ্গী করা কমিক ছবি। (চিত্র নং ৪)

শুরু হল নতুন করে ছবি দেখানো ব্যবসা। সারা দেশ কাইনেটোস্কোপ বাক্সে ছেয়ে গেল। ব্যবসাটা খুব লাভজনক দেখে অনেক লোক এই ব্যবসায় নামল। এই সময়ে ১৮৯৫ সালে টমাস আরমাট নামে একজন কারিগর একটা যন্ত্র তৈরি করলেন, তাতে ছবির ছায়া দেওয়ালে বা পর্দায় ফেলে দেখান যেত। যাকে বলে ম্যাজিক লণ্ঠন।

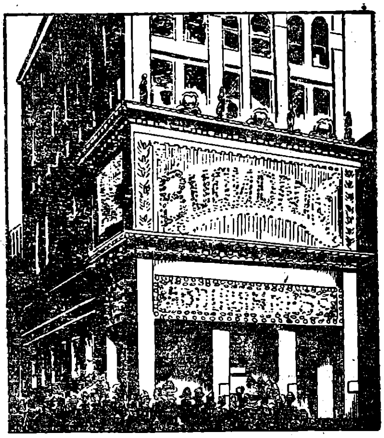
এখানে এডিসনের তৈরী আধুনিক নড়া ছবি দেখান হল প্রথমে। (চিত্র নং ৬)

লোকে বলতে লাগল, এডিসন সাহেব, আপনার মড়া ছবিও পর্দায় ফেলে দেখান। এডিসন ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। দেওয়ালে ফেলে ছবি দেখালে বহুলোক একসঙ্গে দেখতে পাবে। তার ফলে ছবি দেখার খদ্দেরের সংখ্যা তাড়াতাড়ি কমে ব্যবসাটা অচল হয়ে যাবে।

দি গ্রেট ট্রেন রবারি চিত্রের ছবি। এই প্রথম নড়া ছবিতে গল্প এল। (চিত্র নং ৭)

কিন্তু লোকের দাবি এডিসন বেশীদিন উপেক্ষা করতে পারলেন না। আরমাট সাহেবের তৈরী ভিটাস্কোপ প্রোজেক্টারের সাহায্যে তিনি একদিন তাঁর ফিল্ম ভডেভাইল থিয়েটারে প্রদর্শন করলেন। এসব ফিল্ম ছিল থিয়েটারের অভিনয়ের ছবি। মঞ্চের উপর অভিনয় করার আগেই পর্দায় ফেলে সেগুলি দেখানো হতে লাগল। সাধারণ থিয়েটারের অভিনয় যখন বৃহৎ আকারে পর্দায় পড়তে লাগল দর্শকরা তা দেখে নতুনত্বের মোহে উল্লসিত হয়ে উঠল। এই ঘটনায় বোঝা গেল যে মানুষকে আনন্দ দেওয়ার নতুন শিল্প জন্মলাভ করলে। (চিত্র নং ৫ ও ৬)

দি গ্রেট ট্রেন রবারির আর একটা ছবি।
(চিত্র নং ৮)

পর্দায় ফেলা ছবি খুব শীগ্‌গির লোকের কাছে একঘেয়ে হয়ে এল। ১৯০০ সালে দর্শকসংখ্যা এত কমে এল যে মনে হতে লাগল সিনেমা ব্যবসা উঠে যাবে। এই সময়ে এডুইন পোর্টার নামে একজন পরিচালক নতুন ধরনের একটা ফিল্ম তৈরি করলেন।

ছবিটার নাম দেওয়া হল "দি গ্রেট ট্রেন রবারি"। ছবিটা আগের মত কাটা কাটা কতকগুলি দৃশ্যের সমষ্টি নয়। সব ছবিটা একটা গল্প নিয়ে তৈরী। পোর্টার সাহেব ছবিটা আকর্ষণীয় করবার জন্য নানা টেকনিকে ছবিটা তুলেছিলেন। কখনও

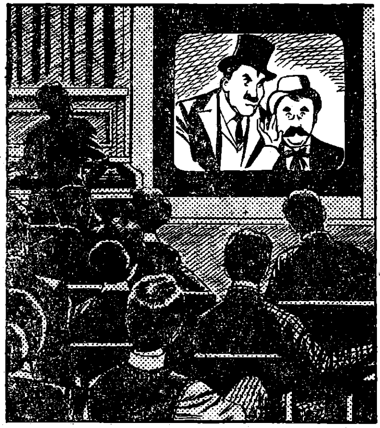

গুদামঘরগুলি সিনেমা হাউসে পরিবর্তিত হয়েছে। পিয়ানো বাজান হচ্ছে ছবি দেখার সময়ে। (চিত্র নং ৯)

দৃশ্যকে কাছে এনে, কখনও দূরে নিয়ে গিয়ে, কখনও বা পাশ থেকে ছবিটা দর্শকদের চোখে নতুন ভাবে দেখালেন। সিনেমা শিল্প আবার পুনর্জীবন লাভ করলে। (চিত্র নং ৭ ও ৮)

দেখতে দেখতে খালি গুদামঘরগুলি সিনেমা হাউসে পরিণত হতে লাগল। বহু প্রযোজক এসে নানা নাটকীয়তায় পূর্ণ ছবি তুলতে শুরু করলে। সেই সব ছবি দেখে দর্শকরা আনন্দে হৈ হৈ করতে লাগল। দর্শনী ছিল মাত্র পাঁচ সেণ্ট। প্রদর্শনী হত মাত্র আধঘণ্টার মত। প্রদর্শনীটা মজাদার করবার জন্যে একজন তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খ্যানখ্যানে পিয়ানো বাজাত। (চিত্র নং ৯)

ছবি তোলার প্রথম দিকে ছবি তোলার কাজগুলি নিউ ইয়র্ক সিটি অথবা নিউ জার্সিতে

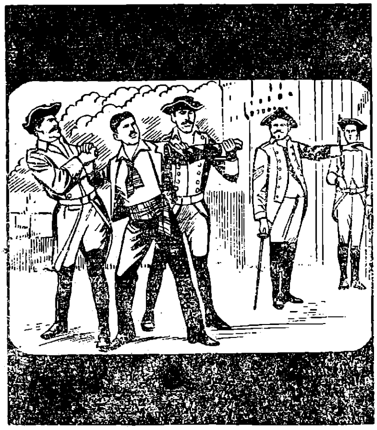

কাউণ্ট অব মন্টিক্রষ্টো প্রথম তোলা হয় ক্যালিফোর্নিয়ায়। তারপর সেখানে সিনেমা শিল্প গজিয়ে ওঠে। (চিত্র নং ১০)

বার্থ অব এ নেশন, ১৯১৫ সালে তোলা হচ্ছে। (চিত্র নং ১১)

করা হত। 'কাউণ্ট অব মন্টিক্রিষ্টো' তোলবার সময়ে একদল লোক ১৯০৭ সালে ক্যালিফোর্নিয়ায় আসে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার রৌদ্রভরা বৃষ্টিহীন আবহাওয়া দেখে প্রযোজকরা বুঝতে পারল এ জায়গা ফিল্ম তৈরীর উপযুক্ত স্থান। তারপর থেকে অন্যান্য প্রযোজকরা সেখানে এসে হাজির হতে লাগল। ১৯১০ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে ক্যালিফোর্নিয়ার হলিউড প্রদেশ পৃথিবীর সিনেমা শিল্পের রাজধানী হয়ে উঠল। (চিত্র নং ১০)

এখন একটা ছবি তুলতে কত লক্ষ টাকা খরচ হয় তা ভাবলে মাথা ঘুরে যায়। কিন্তু ছবি-ইতিহাসের গোড়ার দিকে শিল্পীকে কারিগরের কাজও করতে হত। যখন অভিনয়ের ছবি উঠত না তখন শিল্পীরা দৃশ্যগুলির কাঠামো তৈরি করে তাতে রং লাগাত। এখনকার মত পরিচালকরা তখন আগে গল্প লিখে সিনারিও তৈরি করে প্রস্তুত থাকত না। ছবি তোলার সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমত কাহিনী জুড়ে যেত। তখন

দৃশ্যের দরজা টেবিল ইত্যাদি তৈরি করা রং করা কাজগুলি ছবির অভিনেতা-অভিনেত্রীদের করতে হত। (চিত্র নং ১২)

নির্বাক্ যুগে লরেল হার্ডির ছবি দেখে সকলে হেসে ফেটে পড়ত। (চিত্র নং ১৩)

এইবার চিত্র সবাক্ হয়ে উঠল। প্রথম সবাক্ ছবি—দি জাজ সিঙ্গার। (চিত্র নং ১৪)

ছবি রঙিন হয়ে উঠল। নানারকম শিক্ষা চিত্রের মাধ্যমে দেওয়া হতে লাগল। (চিত্র নং ১৫)

ছবি কথা বলত না। তাই ছবিটা বোঝাবার জন্যে মাঝে মাঝে কাহিনীর লেখা পর্দায় ছবির মত করে দেখানো হত। অভিনেতা-অভিনেত্রীরা তাদের ক্ষমতানুযায়ী মুখভঙ্গী ও চালচলনের সাহায্যে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করত। তখন এই সব ভঙ্গীভরা ছবি দেখে দর্শকরা শুধু যে তারিফ করত তা নয়, সিনেমা আর্ট নিয়ে আলোচনাও করত। (চিত্র নং ১১ ও ১২)

এই সময়ে সব থেকে নাম করেছিল লরেল হার্ডির কমিক ছবিগুলি। লরেল হার্ডির সুমার্জিত পাগলামি ও হাস্যকর মারামারি দেখে লোকে হাসতে হাসতে ফেটে পড়ত। অনেকে হয়তো বাহাদুরি করার জন্যে তাদের নকল করার কল্পনা করত কিন্তু বাস্তবে তা দেখাতে সাহস করত না। (চিত্র নং ১৩)

নির্বাক্ ছবির যুগ চলতে চলতে যখন সবাক্ ছবিতে এসে উপস্থিত হল তখন নির্বাক্ যুগের বহু নামকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীর ভাগ্যে কালো মেঘ নেমে এল। ছবিতে তাদের গলার স্বর ঠিকমত প্রতিফলিত হত না। নতুন অভিনেতা-অভিনেত্রী তাদের স্থানগুলি দখল করে নিতে লাগল। আর ছবির কাজও খুবই জটিল ও ব্যয়বহুল হয়ে উঠল। (চিত্র নং ১৪)

ছবি যে শুধু লোকের চিত্তাকর্ষণের জন্য তৈরী হতে লাগল তা নয়। এখন নানা শিক্ষামূলক কাজের জন্য ছবি তোলা হচ্ছে। একবার ভেবে দেখলে দেখা যাবে ছবিতে আমাদের কত উপকার হচ্ছে। ইতিহাসের কাহিনী একবার দেখলে বারবার পড়ার কাজ হবে। এখন সংবাদও ছবিতে দেখায়। (চিত্র নং ১৫)

ছবির যতই উন্নতি হোক না কেন, মারামারি বা যুদ্ধের ছবি বা বীরত্বের কাহিনী আজও লোকের মনোহরণ করে। কেন বল তো? কারণ মানুষ যতই প্রগতিশীল হোক না কেন, তার মনে সেই চিরন্তন হিরো হবার বাসনা কখনও দূর হয় না। ছবিতে তার বাসনা খানিকটা প্রতিফলিত দেখতে পায় বলে, আজও মানুষ মারামারির ছবি দেখতে ছোটে। (চিত্র নং ১৬)

আজও বীরত্বের কাহিনী নিয়ে সেদেশে ছবি ওঠে। (চিত্র নং ১৬)

ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়

৪

পঞ্চপাণ্ডবরা অনেকদিন কোন নতুন কাজ কিছু করতে না পেরে যখন হতাশ হয়ে পড়েছিল তেমন সময় হঠাৎ একদিন একটি ঘটনা ঘটল।

বাচ্চু বিচ্ছুর বাবা রোজকার মতো অফিস থেকে এসে এদিক সেদিকে চলে যেতেন নিজের মোটরগাড়িটি নিয়ে। সেদিন বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে চললেন কিছু কেনাকাটা করতে। ওদের জন্য ফ্রক, চুলবাঁধা ফিতে, নতুন জুতো ইত্যাদি কিনে কি একটা কাজে ময়দানের স্টেশনে গেলেন। স্টেশনের বাইরে একজায়গায় গাড়িটি রেখে বাচ্চু আর বিচ্ছুকে গাড়ির ভিতর বসতে বলে তিনি সোজা স্টেশনের মধ্যে ঢুকে গেলেন।

তখন সন্ধ্যে সাতটা। শহর আলোকমালায় ঝলমল করছে। গাড়ির ভিতরটা অন্ধকার। বাচ্চু আর বিচ্ছু পিছনের গদিতে বসে বাইরের লোকারণ্য দেখছে।

এমন সময় হঠাৎ দীর্ঘদেহ দুজন লোক এগিয়ে এলো গাড়ির দিকে। কী ভয়ংকর চেহারা লোকদুটোর! বাচ্চু আর বিচ্ছু তাদের দেখে ভয়ে জড়সড় হয়ে গেল। গাড়ির কাছে এগিয়ে এসে লোকদুজন নিজেদের মধ্যে কি যেন আলোচনা করল ফিসফিস করে। তারপর একজন বলল—অনেকগুলো চাবি আছে আমার কাছে। লাগিয়ে দেখি না, একটা-না-একটা নিশ্চয়ই লাগবে।

—কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি। গাড়ির মালিক যদি এসে পড়ে—।

—আরে থাম!

—তবুও—।

—একটু এদিক ওদিক নজর রাখ না তুই।

বাচ্চু আর বিচ্ছু তখন কাঁপছে। কিন্তু এই দারুণ মুহূর্তে তারা একটুও কাঁচা কাজ করল না। অর্থাৎ অযথা ভয় পেয়ে চেঁচামেচি না করে মাথাটা ঝুঁকিয়ে এমন নীচু হয়ে বসে রইল যে সেই লোকদুটো ওদের দেখতেই পেল না।

দু'একটা চাবি অদলবদল করতেই একটা চাবি লেগে গেল। যে লোকটা চাবি লাগাচ্ছিল আনন্দে লাফিয়ে উঠল সে। বলল—যাক, ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে। বেশী হেপাজত পোয়াতে হোল না। উঠে পড়। কুইক!

দ্বিতীয় লোকটি চোখের পলকে উঠে পড়ল গাড়িতে।

তারপর বেশ দক্ষ চালকের মতো গাড়িটা চালিয়ে নিয়ে যেতে যেতে দুজনে চাপা গলায় কত কি সব আলোচনা করতে লাগল।

গাড়িটা কখনো জোরে চলে, কখনো জ্যামে আটকায়। এইভাবে চলতে চলতে শহরের ভিড় যেখানে খুব কম সেখানে এক জায়গায় গিয়ে থামল।

একজন বলল—এঃ, অনেক দেরি হয়ে গেল!

আর একজন বলল—তাড়াতাড়ি। বলেই নেমে পড়ল গাড়ি থেকে।

রাত্রির অন্ধকারে লোকদুটি গাড়ি থেকে নেমে জোর পায়ে হাঁটতে লাগল। অন্ধকার যে খুব ঘন তা নয়। মাঝে মধ্যে লাইট-পোস্টের আলো থাকায় লোকদুটিকে দেখা গেল একটা হোটেলের মধ্যে ঢুকতে।

বাচ্চু বিচ্ছুও সঙ্গে সঙ্গে নেমে পড়ল গাড়ি থেকে। তারপর তাড়াতাড়ি সেই জায়গাটা থেকে সরে গিয়ে একপাশে একটা গলির ধারে গিয়ে দাঁড়াল। কাছেই একটি ডাক্তারখানা ছিল। বাচ্চু বিচ্ছু দেখল একজন ডাক্তার কয়েকজন রোগীকে খুব মনোযোগের সঙ্গে দেখছেন। ডাক্তারখানায় ভিড়ে ভিড়।

বিচ্ছু বলল—আমরা কোথায় এলুম রে দিদি?

—কি জানি।

—আমার ভয় করছে।

—ভয় কি! বাবাকে যেমন করেই হোক একটা ফোন করতে হবে। নাহলে রাস্তা চিনে বাড়ি যেতে পারবো না। তার আগে জানতে হবে এই রাস্তাটার নাম কি।

বিচ্ছু এদিক ওদিক চেয়ে হঠাৎ একটা বন্ধ দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল—ঐ দেখ দিদি, রাস্তাটার নাম লেখা আছে। বেলিলিয়াস লেন। তুই বাবাকে ফোনে বলে দে। এই ডাক্তারখানা থেকে ফোন কর।

বাচ্চু বলল—তা করছি। তুই কিন্তু গাড়িটার দিকে নজর রাখিস। যাতে ওরা

ফিরে এসে গাড়িটা নিয়ে পালাতে না পারে। কেউ গাড়িতে উঠতে গেলেই চেঁচাবি তুই। আমি ততক্ষণে ডাক্তারখানার লোকেদের জানিয়ে দিচ্ছি ব্যাপারটা।

বাচ্চু দূর থেকে বিচ্ছুকে গাড়িটার দিকে নজর রাখতে বলে ডাক্তারখানায় গিয়ে ঢুকল। তারপর সেখানকার লোকেদের সব কথা খুলে বলে ফোন করতে চাইল ওর বাবাকে।

ডাক্তারখানার লোকেরা তো অবাক্ হয়ে গেল সব শুনে। ডাক্তারবাবু বললেন—তুমি ছেলেমানুষ। তুমি কি পারবে লাইন ধরতে? দাঁড়াও আমি ফোনে যোগাযোগ করছি। তুমি বরং কথা বলবে।

এমন সময় বাইরে থেকে বিচ্ছু হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল—এই দিদি, লোকদুটো আবার আসছে রে!

হঠাৎ একটা বন্ধ দোকানের সাইনবোর্ডের দিকে তাকিয়ে বলল— [পৃষ্ঠা ২১২

সঙ্গে সঙ্গে হৈ হৈ করে ডাক্তারখানার লোকেরা ছুটে গেল সেখানে। ততক্ষণে লোকদুটো অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়েছে।

ডাক্তারবাবু অনেকবার ধরে রিঙ করে তবে লাইন পেলেন ফোনের। ওদিক থেকে সাড়া পেতেই তিনি বললেন—হ্যালো, ময়দান লাইট রেলওয়ে? হ্যালো, আমি ডাক্তার বর্মন বলছি। আপনাদের স্টেশনের বাইরে একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন তো কোন ভদ্রলোকের মোটরগাড়ি চুরি গেছে কিনা? তাঁর দুটি মেয়েও ছিল সেই মোটরে।

ওদিক থেকে উত্তর এলো—হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ। এখানে এই ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ হইচই পড়ে গেছে। ভদ্রলোক মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। একটু ধরে থাকুন। আমরা ডাকছি তাঁকে।

একটু পরেই বাচ্চু বিচ্ছুর বাবার গলা শোনা গেল—হ্যালো, আমার মেয়েরা কোথায়? কে আপনি? আমার মেয়েরা নিরাপদে আছে তো?

—আমি ডাক্তার বর্মন বলছি। আপনার মেয়েরা ভাল আছে। তাদের সঙ্গে কথা বলুন। এই বলে ফোনটা বাচ্চুর হাতে দিয়ে দিলেন ডাক্তারবাবু।

বাচ্চু ফোন ধরে ওর বাবাকে সব কথা খুলে বলল। সব শুনে ওর বাবা বললেন —তোরা একটু অপেক্ষা কর। আমি এক্ষুণি যাচ্ছি। বেলিলিয়াস লেন তো ?

বাচ্চু বলল—হ্যাঁ। বেলিলিয়াস লেন। ডাক্তার বর্মন। এই বলে ফোন নামিয়ে রাখল বাচ্চু।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বাচ্চু বিচ্ছুর বাবা এসে পড়লেন। তারপর ডাক্তারবাবুকে ধন্যবাদ জানিয়ে বাচ্চু বিচ্ছুকে নিয়ে নিজের মোটরে গিয়ে বসলেন।

বাচ্চু বলল—বাবা, থানায় একটা খবর দেবে তো ?

—কি হবে খবর দিয়ে। হাওড়া কলকাতা শহরে এরকম মোটর চুরি হামেশাই হচ্ছে। পুলিসও ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠেছে।

বিচ্ছু বলল—তাহলেও পুলিসকে একটু জানিয়ে রাখাটা ভালো।

—কোন দরকার নেই।

বাচ্চু বিচ্ছুদের মোটরগাড়িটা দ্রুত ওদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল।

বাচ্চু বিচ্ছুর বাবা সহজে ছেড়ে দিলেও পাণ্ডব গোয়েন্দারা কিন্তু ব্যাপারটাকে তুচ্ছ বলে ছেড়ে দিতে পারল না। মিত্তিরদের বাগানে সেই ভাঙা বাড়িটার মধ্যে ওদের বৈঠক বসল। বাবলু বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু এবং কানা পঞ্চু সকলেই জড় হোল। বাবলু বলল—আমি কিন্তু এই ব্যাপারটার মধ্যে একটু বেশীরকম গুরুত্ব দিতে চাই। ঐ যে লোকদুটো মোটরগাড়ি চুরি করে উধাও হয়ে যাচ্ছিল ও দুটোকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করে পুলিসের হতে তুলে দিতে হবে।

বিলু বলল—হ্যাঁ। এইটাই হবে আমাদের এইবারের প্রধান কাজ।

ভোম্বল বলল—বেশ রহস্যের গন্ধ আছে কিন্তু ব্যাপারটাতে।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল—কিন্তু ঐ লোকদুটোর খোঁজ পাওয়া যাবে কি করে ?

বাবলু বলল—তোদের গ্যারেজে গিয়ে আজই একবার মোটরগাড়িটা সার্চ করে দেখব। কেননা এই ধরনের লোকেরা প্রায়ই অন্যমনস্ক হয়ে নিজেদের কোন-না-কোন চিহ্ন ফেলে রেখে যায়।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল—বেশ, সবাই মিলে গিয়ে দেখা যাক তাহলে। গাড়ি তো গ্যারেজেই আছে।

বাবলু বলল—আর ঐ হোটেলটা। ওটাতেও নজর রাখতে হবে আমাদের। কেননা ঐ হোটেলেই ওদের আড্ডা। এতে আর কোন সন্দেহ নেই।

বিলু বলল—তবে সর্বাগ্রে গাড়িটাই একবার দেখে আসি চল।

ওরা সকলে একসঙ্গে বাচ্চু বিচ্ছুদের গ্যারেজে চলল তদন্ত করতে। বাবলু একটা টর্চ নিল সঙ্গে। গ্যারেজে গিয়ে গ্যারেজের চাবি খুলে টর্চের আলো ফেলে শুরু করল তন্নতন্ন করে খোঁজাখুঁজি। খুঁজতে খুঁজতে বাবলু হঠাৎ আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল—পেয়েছি পেয়েছি। সকলে তখন ঝুঁকে পড়ল টর্চের আলোটা লক্ষ্য করে। দেখা গেল সামনের দিকের বসবার সীটের কাছে একটা মানিব্যাগ একটা সিগারেটের খোল ও একটা খালি দেশলাই পড়ে আছে।

বাবলু দেশলাই আর সিগারেটের খোলটা পকেটে পুরে মানিব্যাগটা খুলে দেখল মাত্র পাঁচটি টাকা ও কিছু খুচরো পয়সা ছাড়া আর কিছুই নেই তাতে। আর একটি জিনিস আছে। সেটি হচ্ছে একটি নাম ছাপানো কার্ড। নাম ঠিকানা দুইই লেখা আছে তাতে।

বাবলু উৎসাহিত হয়ে বলল—এইটাই তো আমাদের চাই।

বিলু বলল—কি নাম?

ভোম্বল পড়ে বলল—শশধর রায়। ঠিকানা লেখা আছে—১৯, নটবর পাল রোড।

বাচ্চু বিচ্ছু বলল—এবার সর্বাগ্রে ঐ ঠিকানাটা আমাদের খুঁজে বার করতে হবে।

বাবলু ওর পকেট থেকে দেশলাই ও সিগারেটের খোলটা একবার বার করে দেখে তারপর সে দুটো অপ্রয়োজনীয় মনে করে ফেলে দিল। বাচ্চুকে শুধু জিজ্ঞেস করল বাবলু—তোদের বাবা কী সিগারেট খায় জানিস?

বাচ্চু বিচ্ছু বলল—আমাদের বাবা বিড়ি সিগারেটই খায় না।

বাবলু একটু গম্ভীরভাবে বলল এবার—তবে তো খুবই ভালো কথা। যাক্। মনে হচ্ছে আজই আমরা ধরতে পারব আসামীদের। আজ বিকেল থেকেই শুরু হবে আমাদের কাজ। বিকেলে সবাই আমরা যথারীতি জমা হবো, কেমন?

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু সকলেই ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল।

পঞ্চপাণ্ডবরা বিকেলবেলা দল বেঁধে চলল নটবর পাল রোডে শশধর রায়ের ঠিকানা খুঁজে বার করতে। কদমতলা বাজারের কাছ থেকে শুরু হয়েছে নটবর পাল রোড। ওরা একের পর এক বাড়ির নম্বর মেলাতে মেলাতে এক জায়গায় গিয়ে থেমে পড়ল। ভোম্বল বাচ্চু আর বিচ্ছুকে দাঁড়াতে বলে শুধুমাত্র বিলুকে সঙ্গে নিয়ে শশধর রায়ের নেমপ্লেট লেখা বাড়ির সামনে গিয়ে উপস্থিত হোল।

বাড়ির সামনে ছোট্ট একটু বাগান মতো আছে। সেখানে একজন চাকর গোছের লোক ফুলগাছের পরিচর্যা করছিল। বাবলু তাকে ডাকল—এই যে একবার এদিকে এসো তো!

লোকটা কাজ ফেলে এগিয়ে এলো।

বাবলু বলল—শশধরবাবু বাড়িতে আছেন ?

—আছেন।

—একবার ডেকে দাও তো তাঁকে।

লোকটা চলে গেল। লোকটা চলে গেলে বিলু বলল—কি ব্যাপার বল তো ? বাড়িটা তো কোন ভদ্রলোকের বাড়ি বলে মনে হচ্ছে। আমাদের অনুমানে কিছু ভুল হয়নি তো ?

—আমারও তাই মনে হচ্ছে। যাক, ভদ্রলোকের চেহারাটাই দেখি আগে। না মরে ভূত হই কেন।

এমন সময় একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোককে ওদের দিকে আসতে দেখা গেল। ভদ্রলোক কাছে এসে হাসিমুখে বললেন—কে ভাই তোমরা ?

—আপনি আমাদের চিনবেন না। আমরা আপনাকে একটা জিনিস দিতে এসেছি।

—কি জিনিস ?

বাবলু মানিব্যাগটা শশধরবাবুর হাতে দিয়ে দিল।

শশধরবাবু সেটা হাতে পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলেন—আরে! এ কোথায় পেলে ? তিন চার দিন আগে এটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম।

বাবলু তখন কিভাবে সেটা পেয়েছে তা সবিস্তারে খুলে বলল। সব শুনে শশধরবাবু হাসতে হাসতে বললেন—পরশু দিন ঐ গাড়িতে করে আমি আসছিলাম। ঐ গাড়ির মালিক আমার পরম বন্ধু। আমি কিন্তু ভাবতেই পারিনি যে ওটা ওই গাড়িতে ফেলে রেখে এসেছি বলে। যাক, পেয়ে ভালোই হোল। আমি দু'একদিনের ভেতরেই আমার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করবো। আমার কথা তাকে বলো কিন্তু। তবে তোমাদের তো চিনলাম না ভাই। তার তো দুটি মাত্র মেয়ে আছে জানি। ছেলে তো নেই।

বাবলু তখন নিজেদের পরিচয় দিয়ে মোটর চুরির ব্যাপারটা সব বলল এবং কেন তারা এখানে এসেছে তাও বলল। শুনে শশধরবাবু খানিকটা হেসে নিলেন খুব। তারপর ওদের প্রশংসা করে বললেন—এইভাবেই তো বড় বড় গোয়েন্দারা অপরাধীদের ধরে থাকে। তবে তোমরা তো এখন খুব ছোট। তোমরা এখন এসব দিকে ঝোঁক না দিয়ে লেখাপড়ার দিকে মন দাও। আর এই তুচ্ছ ব্যাপারকে নিয়ে অত বেশী মাথা ঘামিও না।

বাবলু বিলু চলে এলো। তারপর ভোম্বল বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে ওরা সোজা

চলল বেলিলিয়াস লেনের দিকে। সেই যেখানে গতকাল বাচ্চু আর বিচ্ছু মোটর থেকে নেমে গলির ধারে লুকিয়েছিল সেইখানে।

বেলিলিয়াস লেনে ঢোকার মুখে একটা বড় হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে বাচ্চু বলল—এই দেখ বাবলুদা সেই হোটেলটা। কাল সেই লোকদুটো এই হোটেলের ভেতর ঢুকেছিল।

বাবলু বলল—তাহলে এটা যে একটা শয়তানের ঘাঁটি হবে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। একবার ভেতরে ঢুকে দেখতে হবে তো।

ভোম্বল বলল—লোকদুটো এমনিও তো শুধু খাওয়াদাওয়া করবার জন্য এখানে এসে থাকতে পারে—

বিলু বলল—পারে। তবে এত জায়গা থাকতে তারা যখন এইরকম একটা বিদঘুটে জায়গা বেছে নিয়েছে তখন এর একটা মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে।

ভোম্বল বলল—আমার সঙ্গে কিছু টাকা আছে। সাইকেল কিনব বলে জমাচ্ছিলাম। তাহলে চল সেই টাকায় সবাই মিলে ঐ হোটেলে ঢুকে কিছু কিনে খাওয়াদাওয়া করি আর চেষ্টা করে দেখি কোন হদিস পাই কিনা।

বাবলু বলল—বেশ। চল তবে হোটেলে ঢুকে কিছু খাওয়া যাক।

ওরা হোটেলে ঢুকতেই দেখল একধারে কয়েকজন লোক বসে বসে তাস খেলছে। পাজী বদমায়েশের মতো চেহারা লোকগুলোর। অপরদিকে দুজন লোক মনোযোগ দিয়ে খাচ্ছে এবং একজন খাবারের অর্ডার দিয়ে বসে আছে।

ওরা ভেতরে ঢুকতেই একজন বয় এগিয়ে এসে বলল—কি চাই তোমাদের? কিছু খাবে? না খাও তো চলে যাও। এখানে দেখবার কিছু নেই।

বাবলু বলল—হ্যাঁ হ্যাঁ, খাবো। আমরা খেতেই এসেছি। কষা মাংস আছে তোমাদের? আমাদের প্রত্যেককে দাও। এই বলে তারা পাঁচজনে এক কোণে গিয়ে বসে পড়ল।

বাচ্চু বিচ্ছু চুপিচুপি বলল—যে লোকগুলো তাস খেলছে কী ভয়ংকর চেহারা তাদের!

বাবলু বলল—ওদের ভেতর সেই লোকদুটো আছে বলে মনে হয়?

—না। তাদের দেখছি না।

বয় এসে কষা মাংস দিয়ে গেল ওদের।

ওরা কাঁটা চামচে দিয়ে খেতে লাগল।

ওরা যখন বেশ তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে তেমন সময় হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকল দীর্ঘদেহ তিনজন বলিষ্ঠ লোক। হোটেলের মালিক তাদের দেখেই তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—কি ব্যাপার, এত দেরি হোল যে?

—আর বলো না ওস্তাদ, একটুর জন্য ফেঁসে গিয়েছিলাম আজ! একটা ব্যাঙ্কে

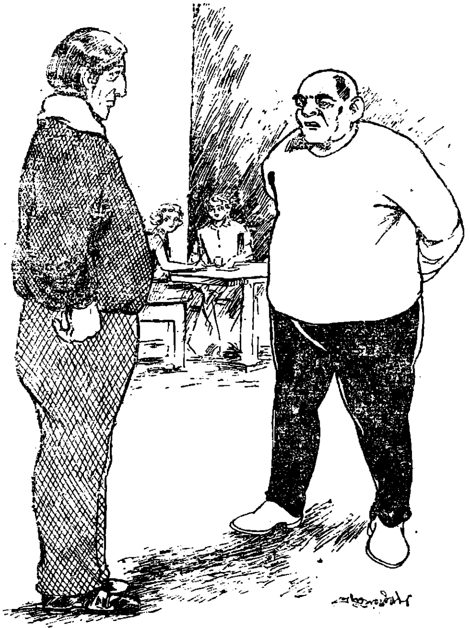

বাচ্চু বলল—দুটো লোককেই আমি চিনে ফেলেছি।

হানা দিয়েছিলুম। সেখানে যে সাদা পোশাকে অত পুলিসের লোক ঘোরাঘুরি করছিল তা তো জানতুম না। খুব জোর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে এসেছি। যাক। যা হোক কিছু খেতে দাও দেখি। তারপর একবার জগাছায় যাই।

—জগাছায় কেন যাবে?

—সেদিন যে মোটরগাড়িটা চুরি করেছি সেটার রঙ বদলানো হোল কিনা দেখে আসতে হবে না?

—হ্যাঁ। দেখে এসো। তবে খুব সাবধান। তোমরা বড় আলগা কাজ করে ফেলছ আজকাল। কাল তো মোটরটা চুরি করে এনেও হাতছাড়া করে ফেললে।

—কালকের ব্যাপারে কোন পুলিস এদিকে নজর রাখেনি তো?

—মনে হয়, না। অবশ্য সেদিকেও কড়া নজর আছে আমার। তবে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি—তোমরা এখন দু'চার দিন এদিকে এসো না। সাবধানের মার নেই। আমি নিজে গিয়ে তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করব।

পঞ্চপাণ্ডবরা ওদের কথা শুনে নিজেদের মধ্যে গা টেপাটিপি করতে লাগল। বাচ্চু বলল—দুটো লোককেই আমি চিনে ফেলেছি। ওরাই তো সেই লোক।

বাবলু ইশারায় বলল—চুপ!

ভোম্বল বলল—জগাছার ঠিকানাটা তো আমাদের জানতে হবে। কি করে জানা যায়?

বাবলু বলল—তোরা ততক্ষণ খা। আমি আসছি।

ভোম্বল বলল—কোথায় যাবি?

বাবলু বলল—ইডিয়েট কোথাকার! এখনো বুঝতে পারছিস না?

ভোম্বল এবার বুঝে গেল বাবলু কোথায় যেতে চায়। বলল—বুঝেছি। বলতে হবে না।

বাবলু উঠে হাত ধুয়ে দরজার কাছে যেতেই হোটেলের মালিক বলল—কি খোকা খাবারের দাম কে দেবে?

বিলু বলল—আমি আমি। আমি দেবো।

—কিন্তু তুমি যাচ্ছ কোথায়?

বাবলু বলল—দই আনতে। মাংসর পর দই খেতে খুব ভালো লাগে। আপনার এখানে তো দই পাবো না, তাই দই কিনতে যাচ্ছি।

বিলু বলল—আমাদের কাছে টাকা পয়সা আছে। ভয় নেই। খাবারের দাম না দিয়ে পালাবো না।

লোক তিনজনের মধ্যে থেকে একজন বলল—এরা কারা?

—ফালতু পার্টি।

আর একজন বলল—এইটুকুটুকু সব ছেলেমেয়ে, এরই মধ্যে হোটেলে ঢুকে খেতে শিখেছে। এদের ভবিষ্যৎ কেমন হবে বুঝে দেখো।

একজন বলল—আমাদের মতো। বলে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

বিলু ভোম্বল বাচ্চু বিচ্ছু তাদের দিকে আর ফিরেও তাকাল না। তারা একমনে নিজেদের খাবার খেয়ে চলল।

কিছু সময়ের মধ্যেই ফিরে এলো বাবলু। তবে সে সঙ্গে করে দই নিয়ে এলো না, নিয়ে এলো পুলিস।

হোটেল থেকে বেরিয়েই সোজা সে চলে গিয়েছিল থানায়। সেখানে তো পুলিসের সঙ্গে চেনাজানা ওদের অনেকদিন থেকেই ছিল। বাবলু থানায় গিয়ে পুলিস অফিসারকে সব কথা খুলে বলতেই তিনি দলবল নিয়ে তৎপর হয়ে ছুটে এলেন। তারপর বাইরে থেকে সর্বাগ্রে হোটেলের চারদিক ঘিরে ফেলে বাবলুর সঙ্গে ভেতরে ঢুকলেন। অন্যান্য পুলিসও একদল ঢুকল ভেতরে।

ঘরের মধ্যে বোমা ফাটলেও বুঝি এতটা চমকাতো না লোকগুলো যতটা চমকালো বাবলুর সঙ্গে পুলিস দেখে। বাবলু বিশেষ বিশেষ লোকগুলোর প্রত্যেকটাকে চিনিয়ে দিয়ে বিলু ভোম্বল বাচ্চু আর বিচ্ছুকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। বাইরে বেরিয়ে এসে পুলিসের গাড়িতেই গিয়ে বসল তারা।

পুলিসের লোকেরা ততক্ষণে সমস্ত লোকগুলোকে ধরে তুলল ভ্যানের ভিতর। পঞ্চপাণ্ডবরা তাদের নিজেদের এই বিরাট সাফল্যে গর্ববোধ করল খুব। পুলিস অফিসারও ওদের প্রত্যেককে ধন্যবাদ জানালেন এবং কথা দিলেন ওদের এই সাফল্যের ব্যাপারটা খবরের কাগজে পাঠিয়ে দেবেন বলে।

———

"৺পূর্ণিমা রায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"র
প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

পরের তরে আত্মদান

শ্রীকিশলয় রায়চৌধুরী

ঢাকা অনাথ আশ্রমের ভূতপূর্ব সুপারিনটেনডেণ্ট শ্রীশচীমোহন রায়ের কনিষ্ঠা কন্যা ৺কুমারী পূর্ণিমা রায়।

জন্ম : ২৮শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৭
মৃত্যু : ১০ই পৌষ, ১৩৭৫

ছোট্ট ছেলে। নাম তার মুন্নু। সে আর তার বাবা—এই দুইএ মিলে এক ছোট্ট সংসার। মুন্নুর চিরসাথী একটি ছোট্ট ছুরি। বয়স তার নয় কি দশ হবে। তার বয়স যখন দু'বছর তখন তার মা প্লেগ রোগে মারা যান। তাই এই মাতৃহীন একমাত্র ছেলের প্রতি তার বাবার অপরিমেয় স্নেহ। এই মুন্নুকে নিয়েই আমি গল্প শুরু করছি।

* * *

আটলান্টিক মহাসাগরের উপকূলে একটি বড় অজ্ঞাতনামা পাহাড় সমুদ্রের তলা থেকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। তাই রাত্রিতে কোন জাহাজ এই জায়গা দিয়ে আসলে তাকে আর ফিরতে হতো না, ঐ জায়গাতেই সমাধিলাভ করতে হতো। তাই বিপদ্ থেকে জাহাজগুলিকে রক্ষা করার জন্য সেখানকার সরকার একটি ব্যবস্থা করলেন। যে সমস্ত জাহাজ রাতের বেলা ঐ অঞ্চলে আসতো, ঐ উপকূলে সমুদ্রের তীরে একটি ঘর থেকে লাল বাতি দেখিয়ে তাদের বিপদ্-সংকেত জানানো হতো। তখন জাহাজের নাবিকেরা বিপদ্ বুঝতে পেরে ঐ অঞ্চল থেকে চলে যেত। এই লাল বাতি দেখানোর জন্য সরকার মুন্নুর বাবাকেই নিযুক্ত করলেন। আর মুন্নুর বাবা এই গুরুদায়িত্ব পালন করে যা পারিশ্রমিক পেতেন তাতে তাঁদের মোটামুটি ভালই চলতো। একেক সময় মুন্নুর মনে ভীষণ কষ্ট হয় তার বাবার ঐরকম কাজ দেখে। তাই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে যে যেমন করেই হোক তার বাবাকে সে সুখী করবে। এমনিভাবে কাটতে থাকে তাদের জীবন।

একদিন মুন্নুর বাবার ভীষণ অসুখ হলো। তিনি ঐ রাতে আর কাজে যেতে পারলেন না। তাই মুন্নু সুযোগ বুঝে তার বাবার কাছে লাল বাতি দেখানোর অনুমতি চায়। তার বাবাও রাজী হয়ে গেলেন। তখন মুন্নু তার সেই চিরসাথী ছোট্ট ছুরিখানা পকেটে নিয়ে মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে সেখানে গেল। মুন্নু ঐ ঘরে গিয়ে আলো জ্বালিয়ে বসে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে সে দেখলো একটি জাহাজ ঐ স্থানের দিকে আসছে। তখন তার লাল বাতি দেখানোর কথা মনে পড়ে গেল। কিন্তু বাতি দেখাতে গিয়ে সে

দেখলো যে সে লাল বাতি আনেনি, এনেছে সাদা বাতি। এখন মুন্নু কি করে? সে বড় ভাবনায় পড়লো। যদি লাল আলো তাড়াতাড়ি দেখাতে না পারে তাহলে জাহাজ এসে পাহাড়ে আছড়ে পড়ে প্রচুর লোক মারা যাবে। বাবারও চাকরি যাবে। অথচ বাড়ি থেকে লাল বাতি আনারও সময় নেই। তখন মুন্নুর মাথায় এক বুদ্ধি এলো। সে গা থেকে তার ছোট্ট গেঞ্জিখানা খুলে টেবিলের উপরে রাখলো এবং ছোট্ট ছুরিখানা নিজের হাতে বসিয়ে দিল। অমনি ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুতে লাগলো। সে কালবিলম্ব না করে তৎক্ষণাৎ গেঞ্জিটা রক্তের মধ্যে চেপে ধরলো। দেখতে দেখতে গেঞ্জিটা লালে লাল হয়ে গেল। এইবার মুন্নু গেঞ্জিটাকে বাতির সামনে ধরলো। আর অমনি চারদিকে লাল আলো ছড়িয়ে পড়লো। জাহাজের নাবিকরা ঐ আলো দেখে সেখান থেকে চলে গেল।

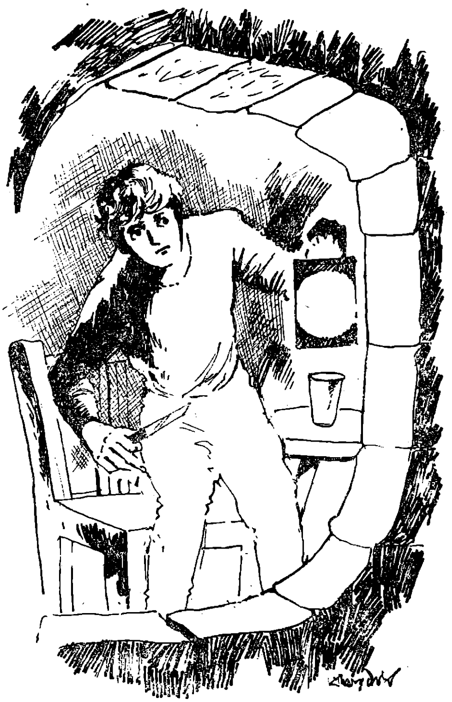

মুন্নু গেঞ্জিটাকে বাতির সামনে ধরলো।

এদিকে পরদিন যখন তার বাবা দেখলেন যে তাঁর আদরের দুলাল মুন্নু এখনো ফেরেনি তখন তাঁর বুকটা এক অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠে। তিনি তৎক্ষণাৎ অতিকষ্টে বিছানা থেকে উঠে ছেলের খোঁজ করতে সমুদ্রের তীরে গেলেন। সেখানে গিয়ে তিনি দেখলেন যে মুন্নুর নশ্বর দেহ পড়ে আছে। হাতের উপর ছুরির আঘাত, মেঝেময় রক্ত—রক্তে লাল করা গেঞ্জি দেখে বুঝতে বাকি রইলো না বাবার মুন্নু তার প্রাণ দিয়ে কর্তব্য পালন করে গেছে। মুন্নুর শোকে কিছুদিন পরে তার বাবারও মৃত্যু হয়।

যাদের জন্য মুন্নু এই বিরাট ত্যাগস্বীকার করে আত্মোৎসর্গ করলো তারা কেউ হয়তো কোনদিন জানতেও পারবে না যে তাদের অজান্তে এক কিশোর নিজের জীবন উৎসর্গ করে গেল তাদের জন্যে।

কিন্তু যাঁর কাছে কোন কিছু অজ্ঞাত থাকে না সেই সর্বব্যাপী ভগবানের কাছে মুন্নু তার ত্যাগের উপযুক্ত পুরস্কারই পাবে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"৺পূর্ণিমা রায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতা"য়
দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা

প্রাণের বিনিময়ে

বিশন মিত্র

টাইম বোম যেখানটায় ফিট করা হয়েছিল তার একটু আগেই ট্রেনটা থেমে পড়েছে। আর ট্রেনটা থামার মিনিট কয়েকের মধ্যে টাইম বোম ফেটে যায়। তীব্র, প্রচণ্ড শব্দে মনে হয়েছিল ট্রেনটা বুঝি চাকার উপর ভর করে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে না, ভূমিশয্যা গ্রহণ করবে। যাত্রীদের নেহাত ভাগ্য ভাল বলতে হবে ট্রেনটা লাইন থেকে গড়িয়ে পড়েনি। সজল আজ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল বলে ট্রেনভর্তি প্যাসেঞ্জারদের প্রাণ অল্পের জন্য রক্ষা পেয়ে গেছে, নইলে এতক্ষণ কি যে কাণ্ড ঘটত তা কল্পনাও করা যায় না। এতক্ষণ হয়ত টাইম বোম বিস্ফোরণের ফলে ট্রেন তো বিধ্বস্ত, চূর্ণবিচূর্ণ হতই উপরন্তু ট্রেনের সমস্ত যাত্রীদের চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যেত না। গরীবের একমাত্র উপায়ক্ষম যুবক সজল যা একখানা খেল দেখাল, পরের জন্য নিঃস্বার্থভাবে যে মহৎ কাজটা করল, সত্যি বলতে তার তুলনা খুঁজলে খুব কমই পাওয়া যাবে। টাইম বোম বিস্ফোরণের ফলে যাত্রীসাধারণ ও ট্রেনের কোন ক্ষতি না হোক অদূরবর্তী রেল লাইনের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে তা কম নয়। লাইন সারিয়ে সুরিয়ে ট্রেন চলার মত পথ পরিষ্কার করে দিতে কম সময় লাগবে না। কাজেই ট্রেন ফাঁকা করে সমস্ত প্যাসেঞ্জার নেমে পড়ে সজলকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের প্রাণরক্ষাকারী নির্ভীক, অকুতোভয় যুবক সজলকে অবাক্ চোখে দেখছে আর ভাবছে আজকের যুগেও এমন ছেলে তাহলে রয়েছে! ভাল-মন্দ মিশিয়েই তাহলে মানুষের সমাজ গড়ে উঠেছে। এখানে শুধু ভাল বা শুধু খারাপ বলে কিছু নেই।

এই যে গরীবের ঘরের ছেলে সজল আপন অন্তর ও বিবেকের অনুপ্রেরণায় এমন বিরল দৃষ্টান্তের মহৎ কাজটা করল সে কিন্তু দারিদ্র্যের তাড়নায় বাধ্য হয়ে অনেক অন্যায় কাজই করেছে। উপযুক্ত পরিবেশ ও আর্থিক আনুকূল্যের অভাবে সে বিপথে পা বাড়াতে বাধ্য হয়েছিল। সে যখন দেখল সুস্থ ও স্বাভাবিক ভাবে বেঁচে থাকবার সমস্ত পথই তার কাছে রুদ্ধ তখন কুপথে, সমাজের চোখে নিন্দনীয় পথে অগ্রসর হতে অনুপ্রাণিত হয়েছিল ক্ষুধার তীব্র তাড়নায়। ঘরে ছোট ছোট ভাই বোন, বিধবা মা সবাই উপোষ করে আছে। পেটে নেই এক কণা খাদ্য। এভাবে চললে মানুষ আর কতদিন বাঁচতে

পারে। সজল আপন বিবেককে অনেক বুঝিয়েছে—সে প্রাণের দায়ে চুরি, ছিনতাই ও পকেট মেরে জীবিকানির্বাহ করছে। আবার ভাল হবার সুযোগ এলে সে অন্যায়, অসামাজিক ও নিন্দনীয় পথ পরিহার করবে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী'—কাজেই ভাল ও সৎ হওয়ার জন্য সদাউন্মুখ সজলের দুঃখের রাত ভোর হতে বিলম্ব হল না। কপাল ফিরল, ভাগ্য সুপ্রসন্ন হল আর অকস্মাৎ এক সুন্দর সকালে সে কারখানায় চাকরি পেয়ে গেল। সৌভাগ্য একবার যার দিকে মুখ তুলে চায় তার কোন দুঃখ থাকে না। তার চাকরি হবার পর সজলদের সংসারেও দুঃখকষ্ট রইল না।

'আজ তোর কারখানা যাওয়া চলবে না।' [পৃষ্ঠা ২২৪

শিক্ষিত যুবক সজল যে পরের উপকার করার সুযোগ পেলে নিজের জীবনটাকে পর্যন্ত হাসিমুখে বিসর্জন দিতে পারে তা কেউ কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিল! চাকরি পাবার পর দুঃসহ অভাব-অনটনের সংসারে কিঞ্চিৎ শান্তি ফিরে এলে সজল যে পুনরায় ভাল হতে পারে তা যেন সকলের কাছে অভাবনীয়, অচিন্তনীয় ছিল। যা ভাবা যায় না ভবিষ্যতে তাই কিন্তু একদিন বাস্তবে পরিণত হয়।

আজ কাজে যাবার পথে সজলের শাগরেদরা তাকে পাকড়াও করল। তারা জানত সজল ভাল হবার চেষ্টা করছে। কিন্তু সে যে ওপথ একদম ছেড়ে দিয়েছে, তার মনের মধ্যে যে দারুণ রকমের পরিবর্তন এসেছে তা তারা জানবে কি করে। মানুষের উপরটা দেখে তার অন্তরটা সঠিক উপলব্ধি করা যায় না। কাজেই শাগরেদরা ধরে নিয়েছিল মোটা টাকার লোভ দেখালে সজল আবার সুড়সুড় করে লক্ষ্মী ছেলের মত তাদের দলে এসে ভিড়বে। হাজার হলেও এপথের একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। একবার এপথে কেউ এলে শত ইচ্ছা থাকলেও সে চট্ করে ফিরে যেতে পারে না। সজলও যে ঐ দলের ছেলে তাতে আর সন্দেহ কি। শাগরেদদের একজন—নাম বিশু মণ্ডল—এব্যাপারে অগ্রণী হয়ে সজলের কাছে কথাটা পাড়ল, 'দেখ সজল, তুই আমাদের পুরনো দোস্ত। তায় তোর শিক্ষাদীক্ষা কম না, বুদ্ধিসুদ্ধিও প্রচুর। তুই যতদিন আমাদের দলে ছিলি ততদিন আমাদের কিছু ভাবতে হয়নি, নির্ভয়েই আমরা কাজকারবার চালিয়ে যাচ্ছিলাম। কারখানায় চাকরি

পাবার পর আজ তুই সতীসাবিত্রী বনে গেছিস মাইরি। হ্যাঁ যা বলতে চাইছিলাম তাই এখন বলি। ভদ্দরলোক বনে গিয়ে তোর দেখছি অনেক উন্নতি হয়েছে। ভালমানুষের ছাপ যেন কে তোর মুখে মেরে দিয়েছে। আগে থাকতে তাই বলে রাখছি—বিশ্বাসঘাতকতা করেছিস কি মরেছিস। যা বলব বিনা কৈফিয়তে করে যাবি। প্রচুর টাকা মিলবে। সন্ধ্যের সময় যে এক্সপ্রেস ট্রেনটা যায় না, ওটাতে আজ এক ধনী ব্যবসায়ী কয়েক লক্ষ টাকা নিয়ে কলকাতা আসছে। বিশ্বস্তসূত্রে খবর পেয়ে আমরা প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। যেন তেন প্রকারেণ টাকা আমাদের হাতাতেই হবে। আগের স্টেশন থেকে আমরা ট্রেনে চড়ব। মাঝপথে রিভলভার দেখিয়ে সব টাকা ছিনতাই করে ট্রেনের চেন টেনে নেমে পড়ে জঙ্গলে আত্মগোপন করব। আর এই স্টেশনের অদূরে ব্রিজটার উপর টাইম বোম ফিট করে রেখেছি। কাজেই ট্রেন ঐখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটবে। সমস্ত ট্রেনটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে। রাহাজানি, ডাকাতির কোন চিহ্নই থাকবে না। আমরা রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাব। তোকে কিন্তু আমাদের সঙ্গে থাকতে হবে আর আমাদের কাজে সহযোগিতা করতে হবে। আজ তোর কারখানা যাওয়া চলবে না।'

সজল প্রাণভয়ে বলল, 'ঠিক আছে তাই হবে। এখন তোদের কথা না শুনলে জানটা আমার অকালেই চলে যাবে।'

বিশু বলল, 'আরে সাঙ্গাৎ অত ঘাবড়াচ্ছ কেন! আমরা থাকতে কেউ তোমার কেশাগ্র স্পর্শ করতে পারবে না। বোঝ না কেন তুমি সঙ্গে থাকলে কাজে যেমন উৎসাহ পাই তেমনি নির্ভয়ে কাজ হাসিল করতে পারি। কি, ঠিক বলিনি?'

সজল আর কি বলবে এব্যাপারে তাই সায় দিয়ে বলে, 'নিশ্চয় নিশ্চয়।'

প্ল্যান মাফিক ধনী ব্যবসায়ীর টাকা ছিনতাই সাঙ্গ হল। এবার দ্বিতীয় ও শেষ ধাপের কাজ সমাপ্ত হলে পরিকল্পনা সার্থক হয়। সজল আর সইতে পারল না এতটা অমানুষিকতা। ট্রেনের এতগুলো লোক নিষ্করুণভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হবে! ওরা তো কোন দোষ করেনি! ট্রেনযাত্রীদের প্রাণ রক্ষা করতে সজল সাঙ্গোপাঙ্গদের চোখে ধুলো দিয়ে কেটে পড়ে। ট্রেনটা যখন টাইম বোমার অদূরবর্তী ঠিক তখন সজল বারবার হাত দেখিয়ে ট্রেন থামাবার প্রাণপণ চেষ্টা করল, কিন্তু সক্ষম না হতে নিজেই লাইনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এবার ড্রাইভারের নজর পড়ল সজলের দিকে। তাকে বাঁচাতে ড্রাইভার ব্রেক কষল, কিন্তু তখন দেরি হয়ে গেছে, সজলকে বাঁচাতে পারল না। টাইম বোমার একটু আগে ট্রেনটা থেমে গেল। সজল নিজের জীবন দিয়ে ট্রেনের সমস্ত যাত্রীর প্রাণ বাঁচিয়ে গেল।

———

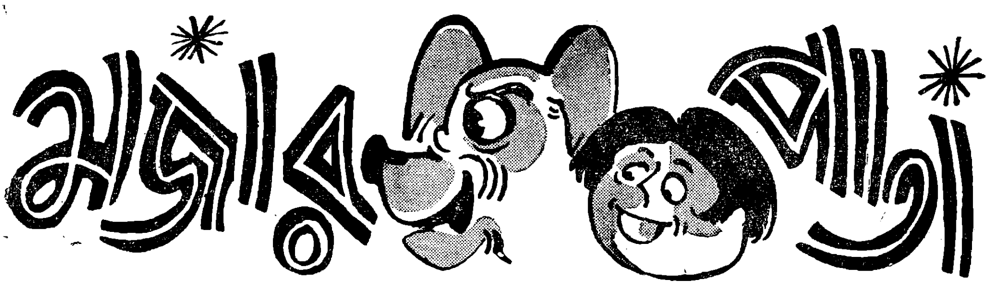

নতুন ধাঁধা

১। বয়ে নিয়ে যায় হেথা হোথা,
মুণ্ডুহীন সত্যি কথা।

—শ্যামাপ্রসাদ দাস, কয়াপাট, হুগলী।

২। অরণ্যের মাঝে দেখ চরের মুণ্ডুখানি,
জানাতে গোপন কথা কহিয়া উঠিল বাণী।

—তুষারকান্তি কোঙার, নিউ তেঁতুলিয়া কলিয়ারী।

৩। অগ্রেতে আমার মাথা,
মধ্যেও ত তা ;
'দয়াময়ী'র চরণ ধরে
পালিয়ে গেল যা !

—পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা, ছড়রা, পুরুলিয়া।

গত ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার উত্তর

১। বাদশা (এই ধাঁধাটির প্রথম লাইনের প্রথম শব্দটি ভুল ছাপা হয়েছে। 'কএ'-র পরিবর্তে 'এক' হবে। এবং প্রায় প্রত্যেকেই ধাঁধাটির এই ভুল শুধরে নিয়ে সঠিক উত্তর পাঠিয়েছে—এজন্য আমরা আনন্দিত।)

২। কামান ৩। জীবন

গত ফাল্গুন সংখ্যার ধাঁধার নির্ভুল উত্তরদাতাদের নাম

কলিকাতা—সুনয়না, শুভ্র ও দেবীকা দত্ত গোবরা রোড ; রঞ্জন, অপন, সমর, পিউ, মা, কাকিমা প্রভৃতি—নয়নচাঁদ দত্ত স্ট্রীট ; পরেশ, নরেশ, সন্দীপ ও অমল রায়—জামির লেন ; সমীরণ ও সংগীতা রায় এবং সুমন মুখার্জী—সেলিমপুর লেন ; রীণা, রীতা, অলক—তালতলা এভেনিউ ; শুভা, চৈতি, বাবুলি ও জুহ—চারু এভেনিউ ; স্বাতী ও কৌশিক দত্ত—রানী হর্ষমুখী রোড ; কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়—বোসপুকুর রোড ; পিকলু, টুবলু ও টুলটুল—পূর্ণ মিত্র লেন ; বিশ্বনন্দন, ডল, কবিতা ও স্মৃতি দাস—গর্চা ফার্স্ট লেন ; সোমা, রুমা, দীপক, বুলু, স্বপন ও মিণ্টু চট্টোপাধ্যায়—দেশবন্ধুনগর ; সমীরণ, নেনা, মিঠু, রূপা, ঝুমা, কমলা, টুটু ও মান্থ চ্যাটার্জী—শঙ্কর হালদার লেন ;

মা, বাবা, মেজমামা, শম্পা, মিন্নি ও পুপু রায়—ডাঃ শরৎ ব্যানার্জী রোড।

২৪ পরগণা—অর্ণব, পল্লব, রাজা, বাবুয়া, শান্টু, তুলতুল ও শুভ্রা—কাঁচড়াপাড়া; মা, বাবা, কাকু, ঝন্টু ও পুতুল দাস—ডায়মণ্ড হারবার; মৌসুমী, চৈতালী, পার্থ ও মিতালী বসু—বারাসত।

হাওড়া—বাপ্পা, রাণা, লালী, খোকন, মামা, দিদিমা ও মাসীমা—হাওড়া-১; তীর্থ, সুহৃদ, স্মৃতি, মনা, মণি ও মানু—আন্দুল রোড; মনা, এলবার্ট, ডলি, ডিউক, বাবলি ও অ্যান্টনি—বি. গার্ডেন; নিতাই, বাবলু, বাচ্চু, অনন্ত ও তপু—ন্যাশনাল প্রেস; বুন্টু, টুন্টু, দিদি, বাবলুদা, প্রদ্যুৎ, জেঠামশাই, মা ও চপল—জগাছা; মীরা, রীতা, কমল, রবীন ও চৈতালী—গণেশ চ্যাটার্জী লেন; ব্রততী রায়—উমেশ ব্যানার্জী লেন; তৃপ্তি, দীপ্তি, প্রীতি, শুক্তি ও মিন্টু বসু—বালী; ব্রততী রায়—উমেশ ব্যানার্জী লেন।

হুগলী—সমীর, সলিল মঞ্জু, ছন্দা ও সীমা বসু—বৈদ্যবাটী।

বর্ধমান—বাবা, মা, দাদা, যমুনা, অশোক ও সুব্রত কর্মকার—বামুনপুর; রাণা ও মধুমিতা দাশগুপ্তা—খদকা পলিটেকনিক; বাবা, মা ও সুবর্ণা দাস—ডিসেরগড়; অমরনাথ পোদ্দার ও সৌরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী—মেমারী; শুক্লা ও দীপঙ্কর মিত্র—অফিসার কলোনী; সন্দীপন গোস্বামী, পার্থসারথি ও অচিন্ত্যকুমার রায়—আসানসোল; দেবাশীষ, শুভাশীষ, শুক্লা ও কাজল বসু এবং জয়িতা কর—ছোটদিঘারী।

নদীয়া—বাবা, মা, শিউলী, মুনভাই, দীপক, বৌদি প্রভৃতি—কল্যাণী; স্বপ্না, শুভ্রা, কাকলী, তপনকুমার ও উত্তমকুমার দত্ত—কৃষ্ণনগর।

মেদিনীপুর—পৃথ্বীশ, পম্পা, শবরী ও রণেন্দ্র-মোহন—খড়্গাপুর; রুমা, গপু, মনু, পানু, শানতি, অমিত, বাসু ও জগন—মহিষাদল; ছোটদি, খোকন, বুটু ও মামণি—ঝাড়গ্রাম; রীতা ও বাবা—খড়্গাপুর।

বীরভূম—বাবা মা, সুপ্রিয়া, সুদেষ্ণা, সুকৃতি ও কমলপ্রিয়া বিশ্বাস—শান্তিনিকেতন; আশীষ, কাঞ্চন, চঞ্চল ও কল্যাণ—আমোদপুর।

বাঁকুড়া—চৈতালী ও অভীক দে—বিষ্ণুপুর; স্বপন, তপন, গোপু ও মনু—বাঁকুড়া।

পুরুলিয়া—তপেশচন্দ্র মাজী ও পুণ্ডরীকাক্ষ হাজরা—ছড়রা; কল্যাণ, কণিকা, কবিতা, কাজল ও কল্লোল বিশ্বাস—আদরা; অজিত, বাঘাম্বর, রঘুনাথ, সুদর্শন ও মহাদেব—আদরা; সুদর্শন ও অজয় নন্দী—আনাড়া; শ্রীরাজ চৌধুরী- মধুপুর; প্রদীপ, দীপালি, নির্মাল্য মিতালী, শেফালী ও চৈতালী ব্যানার্জী—রাঙ্গাডি।

বিহার—ভাস্বতী, ব্রততী ও অরুণ মৈত্র—রাঁচী; দেবব্রত, সত্যব্রত মৈত্র—হিনু; স্বপ্না ও হাসু মুখার্জী—বর্ধমান কম্পাউণ্ড; অঞ্জন, কাঞ্চন, শর্বরী, মালা, কানন ও মা—রাঁচী; স্বপন কবিতা, তরুণ, বাবা ও মামা—হিনু; অনুপ ও অঞ্জনা—জামসেদপুর-৪; ভাটা, লান্টু, গৌতম, রেশমী, শীলা ও সুব্রত কুণ্ডু—ধানবাদ; স্বপ্না, অপর্ণা, অনন্যা, শান্তনু ও জয়দীপ—জামসেদপুর-৪।

আসাম—অঞ্জনা, পাপড়ি ও পাপিয়া—হাফলং।

উত্তরপ্রদেশ—মালবিকা দাশগুপ্তা—অশোকনগর।

নতুন দিল্লী—খোকন, নচো ও নিকিতা লাহিড়ী—সরোজিনীনগর।

মধ্যপ্রদেশ—মা, সুবীর, জ্যোতি দীপ্তি, উৎপল, জয়ন্ত ও প্রশান্ত—রায়পুর; চন্দন, স্বপন, বনমালী, প্রদীপ, রুবি ও ছবি—রায়পুর।

ভ্রম সংশোধন

গত চৈত্র সংখ্যায় ৺শঙ্কর মুখোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য-প্রতিযোগিতার স্থলে ৺শঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ছাপা হওয়ায় আমরা আন্তরিক লজ্জিত। —শুঃ সঃ

মন খারাপ

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

সকলের মন খারাপ!

হবে নাই বা কেন? কতো আশা নিয়ে ভারত এবার রেঙ্গুনে গিয়েছিল প্রাক্-অলিম্পিক ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে। এতো চেষ্টা, এতো প্রশিক্ষণ সব কিছুই বিফলে গেলো। বিভাগ বাছাইএর জন্যে প্রথম খেলায় ভারত বার্মার কাছে হেরে গেলো ৪-৩ গোলে। তারপর শুরু হলো বিভাগীয় লীগের খেলা। দুটি খেলায় দুটিতেই হারলো ভারত। ইন্দোনেশিয়ার কাছে ৪-২ গোলে আর ইজরায়েলের কাছে ১-০ গোলে। ফলে প্রাক্-অলিম্পিক ফুটবলের ছাঁটাই পর্বেই ভারতকে বিদায় নিতে হলো।

এর পরেও কি বিল্টু-মন্টুদের মন খারাপ হবে না? কি লজ্জার কথা! গত বছর ভারতীয় ক্রিকেট দল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর ইংলণ্ডকে হারিয়ে রাবার জেতায় সেজদাদু খুশী হয়েছিলেন। খেলাধূলার ব্যাপারে আগের মতো তিনি মারমুখী ছিলেন না। বরঞ্চ মাঝে মাঝে ওদের সঙ্গে ক্রিকেট খেলার বিষয় নিয়েও আলোচনা করতেন। বিল্টুর ব্যাটটা ভেঙ্গে গেছে শুনে ওকে তো একটা ব্যাটই কিনে দিয়েছিলেন সেজদাদু! সেজদাদু ব্যাট কিনে দিয়েছেন! আর কি? ওদের দেখে কে? গলিতে, পার্কে, ময়দানে ওরা শুধু ক্রিকেটই খেলেছে। দিব্যি মজায় ছিল ওরা।

তাই ওদের মন খারাপ। রেঙ্গুনে যা হলো—তারপর সেজদাদুর সামনে আর যাওয়াই যাবে না। একে রাগী মানুষ, তার ওপর সব কটি খেলাতেই ভারতের হার! রেগে একেবারে আগুন হয়ে আছেন বিল্টু-মন্টুদের সেজদাদু। মন অবশ্য নণ্টে-ভণ্টেদেরও খারাপ। ভারতের সব কটি খেলাতেই হেরে যাওয়া কেউই খুশী মনে নিতে পারছেন না। কারণ, গত বছর মারডেকা ফুটবলে বার্মার কাছে ভারতের ন'গোল খাওয়ার কথা কেউই ভোলেন নি। তার ওপর এবছরের প্রাক্-অলিম্পিক ফুটবলে সব কটি খেলাতেই ভারতের পরাজয় সত্যিই লজ্জার কথা।

ওদিকে রণজি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে বাংলা আট উইকেটে মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে দিয়েছে। সেমিফাইনালে বাংলাকে খেলতে হবে পঞ্জাব আর হায়দরাবাদের বিজয়ী দলের সঙ্গে। হায়দরাবাদ দলের অধিনায়ক হলেন এম. এল. জয়সীমা। এছাড়া দলে আছেন—মনসুর আলী পাতৌদি, আব্বাস আলী বেগ, জয়ন্তীলাল, কৃষ্ণমূর্তি, গোবিন্দরাজ প্রভৃতির মতো নামকরা খেলোয়াড়রা। তাই মনে হয় রণজি ট্রফির সেমিফাইনালে বাংলাকে খেলতে হবে হায়দরাবাদের সঙ্গেই!

এক ছোট্ট এ্যাকাউণ্ট কেন বলা হয় ? আমার কাছে এটা খুবই বড়

আমার পি এন বির পাশবইটি আমি খুব পছন্দ করি। এটি আমার খুব দরকারী বই। এর জন্য আমার গর্ববোধ হয়। তোমরাও এক একটি এই পাশবই পেতে পার। তোমাদের বাবা মাকে বলে দেখ না...

পি এন বিতে ছোটদের জন্য যে এ্যাকাউণ্ট আছে তা ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। শিশুর সঙ্গে সঙ্গে এই এ্যাকাউণ্টও বাড়তে থাকবে। উপার্জিত সুদ জমা হয়ে অনেক অর্থ সঞ্চয় হবে যাতে ছেলেমেয়েদের উচ্চ শিক্ষা, উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, বিবাহ প্রভৃতির ব্যবস্থা করা যাবে।

১৪ বছরের বেশী ছেলেমেয়েরা এই এ্যাকাউণ্ট রাখতে পারে। এতে ছোটদের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি হয় এবং অল্প বয়সেই সঞ্চয়ের ইচ্ছা জাগে—ভবিষ্যৎ জীবনে এই শিক্ষা একটি বিরাট সম্বল।

আপনার নিকটবর্ত্তী পি এন বির শাখায় আসুন। সারা ভারতবর্ষে আমাদের ৮১০টিরও বেশী শাখা আছে। সাহায্য করার জন্য সদা উদগ্রীব আমাদের ম্যানেজারেরা আপনাদের এবং আপনাদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করতে পেলে সুখী হবেন।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে
জাতির সেবায় নিয়োজিত

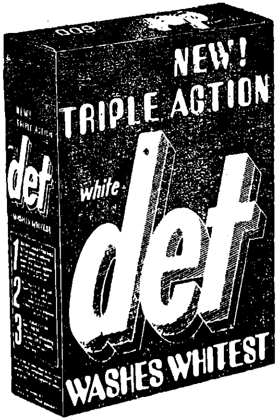

নতুন তিন ভাবে কার্যকর ডেট

- নতুন ডেট একটি খুব সাদা পাউডার··· যাতে রয়েছে সবচেয়ে সাদা ক'রে কাপড় ধোয়ার জন্যে একটি উৎকৃষ্ট পদার্থ।
- নতুন ডেটে রয়েছে সাদা করার বাড়তি শক্তি। এটি কাপড়ের পুরনো ময়লাও দুর ক'রে দেয় আর রঙীন কাপড় উজ্জ্বল ক'রে তোলে।
- নতুন ডেটে প্রচুর ফেনা হয় আর এই ফেনায় রয়েছে কাপড়- চোপড় নরম করার বিশেষ গুণ। এটি যেমন আপনার জামাকাপড়ের পক্ষে সবচেয়ে নিরাপদ···তেমনি আপনার হাতের পক্ষেও সবচেয়ে নরম।

৫টি নতুন সাইজে পাবেন : ডেট ২০০, ৪০০, ৬০০, ৮০০, ১০০০
তাছাড়াও পাওয়া যাচ্ছে—নীল ডেট

Shilpi·HPMA 61F/71 Ben

dCP/GLT/9f ben

আজকে আমার বয়স হ'ল নয়।
প্রতিদিনই মোর বাড়ছে টাকা নেই তাতে সংশয়...

জানতে চাও
সে কেমন করে হয়?

আমি যখন আরও ছোট ছিলাম তখন থেকেই আমার টাকা বাড়তে শুরু করেছিলো। আমার বাবা মাত্র ৫৲ টাকা দিয়ে চার্টার্ড ব্যাঙ্কে একটা সেভিংস একাউন্ট খুলে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই আমি প্রতিমাসে কিছু না কিছু জমিয়েছি আমার ডোনাল্ড ডাক টাকা জমানোর বাক্সে।

**চার্টার্ড ব্যাঙ্কে
আপনার সন্তানের
টাকা জমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে
আমাদের সাহায্য নিন।**

দি চার্টার্ড ব্যাঙ্ক

অমৃতসর, বম্বে, কলিকাতা, কালিকাট, কোচিন,
দিল্লী, কানপুর, মাদ্রাজ, নিউ দিল্লী, সান্তাজী।

সর্বজন প্রশংসিত এবং বহুল প্রচারিত

সুবলচন্দ্র মিত্র প্রণীত

সরল বাঙ্গালা অভিধান মূল্য ২৫·00

ডাকমাশুল সহ টা. ৩০·০০ স্থলে টা. ২৫·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Century Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 12·00

Century Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 12·00

ডাকমাশুল সহ টা. ১৫·০০ স্থলে মাত্র টা. ১২·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

Pocket Dictionary (ENG.-BENG.) Price Rs. 6·50

Pocket Dictionary (BENG.-ENG.) Price Rs. 6·50

ডাকমাশুল সহ টা. ৮·০০ স্থলে মাত্র টা. ৭·০০ অগ্রিম পাঠালে রেজিস্ট্রি ডাকে পাঠান হচ্ছে

NEW BENGAL PRESS (Private) Ltd., 68, College Street, Calcutta-12

দে ব সা হি ত্য কু টী রে

= বাহির হইল =

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী প্রণীত—সেই বহু পুরাতন—

ছেলেমেয়েদের মনমাতানো—

❋ টুন্-টুনির বই ❋

নব কলেবরে বাহির হইল। পাতায় পাতায় ছবি,

তিন রংয়ের প্রচ্ছদপট, ডিমাই সাইজ।

দাম—২·৫০ পয়সা

হাসির গল্প

হাসতে যারা জানে না, তারাও হাসবে।
গল্পের বই পড়তে যাঁদের ভাল লাগে না,
তারাও একবার পড়তে শুরু করলে
শেষ না করে ছাড়বে না, এমন মজার বই।

শিবরাম চক্রবর্তীর
হাসির টেক্কা - ৪.০০

দেব সাহিত্য কুটীর সম্পাদিত
হাসির এ্যাটম বোম ৪.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
হাসির ফোয়ারা-৪.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
জন্মদিনের উপহার-৩.০০

শিবরাম চক্রবর্তীর
উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে-১.২৫

বিশ্বপ্রতিভা সিরিজ

পৃথিবীর সর্বদেশের মহামনীষীদের জীবনালেখ্য!
ছোটদের এখন থেকেই এই সব মনীষীদের
জীবনী জানবার সুযোগ দিলে ভবিষ্যতে
তারা তাদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করবে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের
বিশ্বজয়ী বিবেকানন্দ ৪.০০
রাষ্ট্রনেতা জওহরলাল ৩.০০

হেমেন্দ্রবিজয় সেনের
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ২.৫০

সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়ের
জনসেবক লেনিন ২.০০

রবিদাস সাহারায়ের
আমাদের রবীন্দ্রনাথ ৪.০০
ভগিনী নিবেদিতা ৪.০০

দেব সাহিত্য কুটীর • ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা

টারজান !!!

যার অতুলনীয় শক্তি ও অলৌকিক ক্ষমতা জগৎকে বিস্মিত করেছে। গরিলা-মাতা পালিত সেই টারজান জানতে হলে এই বইগুলি পড়ুন।

১। অ্যাডভেঞ্চার অব টারজান
২। টারজান দি এপ্‌ম্যান
৩। টারজান ইন দি জাঙ্গল
৪। টারজান এণ্ড হিজ সন
৫। টারজান এণ্ড হিজ ফ্রেণ্ড
৬। টারজান দি মাইটি

এইরূপ ১২ খানি বই প্রত্যেকখানির দাম—১·৫০

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী

জটিল রহস্যভরা—পিরামিড সিরিজ ও বিচিত্রা সিরিজ

রক্তলোভী হিংস্র চতুর আততায়ীদের সঙ্গে বুদ্ধিমান গোয়েন্দাদের সংঘর্ষ। পড়তে পড়তে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসে—এমনই ভয়াবহ লোমহর্ষণ কাহিনী **এই দুই সিরিজ। পড়ুন !!!**

পিরামিড সিরিজ

ডেঞ্জার সিগন্যাল
সিক্রেট সেফ
ডিভোর্সড ওয়াইফ্
টু মেনি মার্ডার্স
ডেসপারেট লেডি
জাঙ্গল উওম্যান
ডায়মণ্ড মাইনস
মিস্‌ড্ ওয়াইফ
ডার্ক রুম
টাইগার ম্যান

এইরূপ ২৭ খানি বই প্রত্যেকখানির দাম—১·৫০

বিচিত্রা সিরিজ

গুপ্তধনের দুঃস্বপ্ন ... ২·০০
বাঘরাজের অভিযান ... ২·০০
নিশাচরী বিভীষিকা ... ২·০০
চতুর্ভুজের স্বাক্ষর ... ২·০০

দেব সাহিত্য কুটীর প্রাইভেট লিঃ—২১, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা-৯